পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

শিক্ষা ও সভ্যতা

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবারিদকান্তি বসু

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩৩৪

দাম দেড় টাকা

কলিকাতা, ৩১নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

— ৺পিতৃদেবের স্মরণে —

মুখবন্ধ

এ বইএর প্রবন্ধগুলির বেশীর ভাগ 'সবুজ পত্রে', আর বাকী কয়েকটি কয়েকখানা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'সবুজের হিন্দুয়ানী' প্রবন্ধটি নবপর্য্যায় 'সবুজ পত্রের' প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা। উপলক্ষ্যের উপযোগী আকারটি বদ্‌লালে বক্তব্য বহাল থাকলেও রসটা ঠিক থাকে না দেখে ওর সে আকারটি আর বদ্‌লাইনি। প্রবন্ধগুলিকে পুঁথিতে গেঁথে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা উচিত হ'ল, না পুরণো মাসিক-সাপ্তাহিকের স্তূপের মধ্যে বিস্মৃতির কবর দেওয়াই সমীচীন হ'ত তাতে অবশ্য সন্দেহ আছে। তবে, "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্"।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

আশ্বিন, ১৩৩৪

সূচীপত্র

শিক্ষার লক্ষ্য	১
অন্নচিন্তা	২১
রোম	৪০
আর্য্যামি	৫৭
বৈশ্য	৭৮
সবুজের হিন্দুয়ানী	৯৯
ধর্ম্ম-শাস্ত্র	১১০
চাষী	১২০
ভারতবর্ষ	১৩০
তুতান্-খামেন্	১৩৭
গণেশ	১৪৪
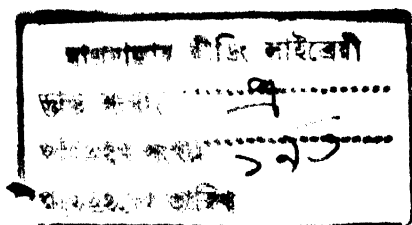
শিক্ষার লক্ষ্য

(১)

শিক্ষা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তত্ত্বকথা প্রচলিত আছে, যাদের উদ্দেশ্য—কিছুই না বলিয়া, সমগ্র বিষয়টার একটা সর্ব্বজনসম্মত সুগভীর মীমাংসা করা। এই সকল তত্ত্ববাক্যের মধ্যে একটী এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যথার্থ মানুষ তৈরী করা। মানব-শিশু যখন সচরাচর মানুষের শরীর ও মন লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়,—এবং যেটী না হয়, শিক্ষার দ্বারা তাহাকে যথার্থ মানুষ করার চেষ্টা স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষেও নিষ্ফল,—তখন যথার্থ মানুষ কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বজ্ঞেরা অবশ্য উত্তরে বলিবেন—আদর্শ-মানবকে, অর্থাৎ অসাধারণ মনুষ্যকে। আদর্শ-মানব

যে কি প্রকার জীব, সে সম্বন্ধে কাহারও সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনও রূপ ধারণা না থাকাতে, জিনিসটা যে অতিশয় কাম্য এবং শিক্ষার দ্বারা অবশ্যলভ্য, এ বিষয়ে কাহারও কোনও দ্বিধা উপস্থিত হয় না; এবং একটা দুরূহ প্রশ্নের সহজ সমাধানে মনও প্রসন্ন হইয়া ওঠে। ইহার পরেও যদি কেহ জানিতে চায় আদর্শ-মনুষ্য কাহাকে বলে, তবে অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন। তবে কোনও কোনও তত্ত্বজ্ঞ হয়তো অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন যে, আদর্শ-মনুষ্য সেই, যাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল শক্তি বা বৃত্তিই সম্যক অনুশীলিত হইয়াছে ও পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর মানুষ গড়িয়া তোলা। এখন কথা এই যে, প্রথমত এহেন মানুষ চর্ম্মচক্ষে দূরের কথা, কেহ কখনও মানস-নেত্রেও দেখেন নাই। পৃথিবীর কবি ও কল্পনাকুশল লোকেরা যে-সকল মহাপুরুষ ও অতি-মানুষের আদর্শ-চিত্র আঁকিয়াছেন, সে সকলের কোনটিই একাধারে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অসম্ভব মানুষের চিত্র নয়। সেগুলির কোনটিতে দেখিতে পাই বহু-শক্তির একত্র সমাবেশ, কোনটিতে বা দু-একটি বৃত্তির অতিমাত্রায় বিকাশ; কিন্তু তাহার প্রতিটিই রক্তমাংসের মানুষেরই চিত্র। দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি দূরে থাক—দুই চারিটি শক্তির একসঙ্গে একটু অসাধারণ রকম স্ফূর্ত্তির পরিচয় যাহার শরীরে আছে, এমন লোক হাজারে একজন মেলা কঠিন; অথচ শিক্ষা যে সকলের

জন্যই প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। তপস্বী বাল্মীকি যখন নারদকে বীর্য্যবান, ধর্ম্মজ্ঞ, বিদ্বান প্রভৃতি অশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ত্রিলোকজ্ঞ নারদ সেই ত্রেতাযুগেও ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব রামচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও নাম করিতে পারেন নাই। এবং কোনও বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে রামচন্দ্র যে এই সকল গুণের আধার হইয়াছিলেন, এমন কথা নারদও বাল্মীকিকে বলেন নাই, বাল্মীকিও আমাদিগকে বলিয়া যান নাই। তৃতীয় কথা, যদি প্রকৃতই আদর্শ-মানব বা অতিমানুষ গড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত এবং এই উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ শিক্ষার ফলে পৃথিবীটা মানুষের পক্ষে বাসের উপযুক্ত থাকিত কিনা, সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সমাজ-বন্ধনের ভিত্তির উপর মানুষের সভ্যতার ইমারত গঠিত হইয়াছে, তাহার মূল এই যে, মানুষে মানুষে শক্তির প্রভেদ আছে, এবং সে প্রভেদ কোনও শিক্ষার সাহায্যে সম্পূর্ণ লোপ করা যায় না। এই পার্থক্য ও তারতম্য আছে বলিয়াই সমাজে শ্রমবিভাগ ও কার্য্যবিভাগ সম্ভবপর হইয়াছে, এবং এই বিভিন্নতার উপর মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতে অদ্যাবধি সমস্ত পরিণতি নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। যদি শিক্ষার ফলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া সকলকেই সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন আদর্শ-মানুষে পরিণত করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে সমাজের সমস্ত কাজের কল-কারখানা তখনি বন্ধ হইয়া যাইত।

মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে বলিয়াই মানুষের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। যদি শিক্ষার ফলে সকলেই আদর্শ-মানুষ, অর্থাৎ এক ছাঁচের মানুষ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের সঙ্গ আমাদের নিকট এমনই অসহ্য বোধ হইত যে, মানুষ ঘর ছাড়িয়া বনে পালাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিত না। শেষ কথা, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক একজন অতিমানুষের জন্ম হয়। তাহার ফলে কর্ম্মের জগতে বা চিন্তার রাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ রাখিলে সমাজ যদি কেবল অতি-মানুষেরই সমাজ হইত তাহা হইলে ব্যাপারটা কি ঘটিত মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া ওঠে।

অতএব তত্ত্ববেত্তারা যাহাই বলুন না কেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ-মানুষ গড়াও নয়, অতিমানুষ তৈরীও নয়। কেননা এই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হইবার সুদূর সম্ভাবনাও নাই, এবং যদি কোনও সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে তাহার ফল অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞলোকদের আর একটী মত এই যে, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত—ছাত্রের চরিত্রগঠন। চরিত্র জিনিসটা কি, তাহা লইয়া তর্ক না-ই তুলিলাম। ধরিয়া লওয়া যাক্ চরিত্র সেই সকল গুণের সমঞ্জসীকৃত সমষ্টি, যাহা মানুষের থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এই সকল গুণের তালিকা এবং সমষ্টির বিষয়, তাহাদের রূপ ও মাত্রা সম্বন্ধে, বিভিন্ন কালে

শিক্ষার লক্ষ্য

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা যে ছিল এবং আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ভিন্ন দেশকালের প্রচলিত মত কিছু এক নয়। এই বিজ্ঞ বচনের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনও শিক্ষাপ্রণালীই প্রকৃত কাজের বেলায় ছাত্রের চরিত্রগঠনকে তাহার প্রধান লক্ষ্যস্বরূপে গ্রাহ্য করে নাই। যিনি শিক্ষার দ্বারা চরিত্রগঠন বিষয়ে অতিমাত্র উদ্যোগী, তিনিও সাহিত্যের একশ' পাতার মধ্যে দশ পাতা হিতোপদেশ থাকিলে ভাল হয়, এই কথাই বলেন, এবং ইস্কুলের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টার জন্যেই নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার কারণ এ নয় যে, মানুষের চরিত্র জিনিসটা সমাজের পক্ষে কিছু কম প্রয়োজনীয়; ইহার কারণ এই যে, চরিত্র জিনিসটা সেরূপ শিক্ষণীয় নয়। মানুষের চরিত্র প্রধানতঃ নির্ভর করে বংশানুক্রম এবং পরিবার ও সমাজের বিশেষ অবস্থার উপর। কেবলমাত্র শিক্ষকের শিক্ষার দ্বারা চরিত্রে যে পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য; এবং তাহাও আবার শিক্ষার গৌণ ফল। সোজাসুজি নীতিশিক্ষার দ্বারা চরিত্র গড়িবার চেষ্টা করিলে, সে শিক্ষা অতি নীরস হইয়া ওঠে—এবং তাহার ফলও প্রায়ই বিপরীত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্লেটো তাঁহার যে-সকল মত সক্রেটিসের নামে চালাইয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা মত এই যে, চরিত্র বা virtues জ্যামিতি ও অলঙ্কার-

শাস্ত্রের ন্যায়ই একটা শিক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু এই মতের মূলে আছে তাঁহার আর একটী মত। (প্লেটোর মতে ভালমন্দের জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করা যায়,—এবং সেই জ্ঞান লাভ করিলেই মানুষ সচ্চরিত্র হয়।) এই জ্ঞানবাদের—intellectualism-এর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক মনীষী আজ লেখনী ধরিয়াছেন; এবং বেদাধ্যয়নেও যে দুরাত্মার চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা আমাদের দেশের উদ্ভট কবিতার অজ্ঞাত-নামা কবি অনেক পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটা ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সহিত বিলাতের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং আমরাও শুনিয়া শুনিয়া বলি যে, বিলাতে ইস্কুল-কলেজে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়, আর আমাদের ইস্কুল-কলেজ হইতে ছাত্রেরা কেবল কতকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া চলিয়া আসে। কথাটা সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাক্। কিন্তু ইহাতে এ প্রমাণ হয় না যে, বিলাতের ইস্কুল ও ইউনিভার্সিটীতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলেই ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়। বরং আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা উল্টো কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, সেখানকার ইস্কুল-ইউনিভার্সিটির life বা আব্‌হাওয়াতেই শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়িয়া ওঠে অর্থাৎ সেখানকার ছাত্রদের চরিত্র সেখানকার বিদ্যালয়গুলির সামাজিক জীবনের ফল,

শিক্ষার ফল নয়। সুতরাং সামাজিক অবস্থার গুণে যেটা আপ্‌না হইতেই জন্মলাভ করে, সেটাকে শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের ছাত্রগণের কোনও হিতৈষী যেন তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে শেলীর পরিবর্ত্তে Smiles-এর আমদানী না করেন।

(৩)

এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আদর্শ-মানুষ গড়াও না হয়, শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন করাও না হয়—তবে তাহার উদ্দেশ্যটা কি? এ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়, এবং সে উত্তরও সকলেরই জানা আছে; কিন্তু সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর লজ্জিত হই। কেননা উত্তরটা অতি সাধারণ রকমের, এবং বড় কথা বলিয়া ও শুনিয়া আমরা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি—সোজা কথা বলায় ও শোনায় আমরা সে সুখে বঞ্চিত হই। কথাটা এই যে—শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া; অর্থাৎ যার প্রথম সোপানকে সমস্ত বিষয়টার নামস্বরূপে ব্যবহার করিয়া আমরা বাঙ্গলা কথায় বলি—লেখাপড়া শিখান। কি পুরাতন, কি বর্ত্তমান সমস্ত শিক্ষা-প্রণালীর লক্ষ্যই যে এই বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, তাহা টোল, পাঠশালা, ইস্কুল, কলেজগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই স্থূল বিষয়টা আর কাহারও চোখ এড়াইবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষার

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে-সকল তত্ত্বকথা আছে, তাহাদের উদ্দেশ্যই এই নিতান্ত সোজা কথাটাকে চাপা দেওয়া, যাহাতে তাহা নিজগুণে প্রকাশ না হইয়া পড়ে।

তত্ত্বজ্ঞানীদের সমস্ত বচন উপেক্ষা করিয়া এবং বিজ্ঞব্যক্তি-দের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, পৃথিবীর শিক্ষালয়গুলি যখন বরাবর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকেই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে, তখন ইহার মূলে যে নিছক বোকামী ছাড়া আরও কিছু আছে, তাহাতে অতি-বুদ্ধিমান ভিন্ন আর কেহ সন্দেহ করিবেন না। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, বিদ্যাশিক্ষাই যে কার্য্যতঃ শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া আছে, কেবল তাহাই নহে,—প্রকৃতপক্ষে উহাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, বিদ্যাশিক্ষা জিনিসটা মানবসমাজের যুগযুগান্তরসঞ্চিত সভ্যতার সহিত পৃথিবীতে নবাগত মানব সন্তানের পরিচয় করান। এই পরিচয় শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব, এবং শিক্ষা ভিন্ন আর কোনও রকমেই হইবার উপায় নাই। আদিম কাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বহু-আয়াসলব্ধ সভ্যতার ফল নানা বিদ্যারূপে সঞ্চিত আছে ও হইতেছে। শিক্ষা এই বিদ্যাগুলির সঙ্গে মানুষের পরিচয় সাধন করে। অতি সভ্যসমাজের শিশুও অসভ্য হইয়া জন্মায়, এবং শিক্ষার মধ্য দিয়া এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচয় লাভ না করিলে অসভ্য অবস্থাতেই বাড়িয়া উঠিত। অসভ্য অর্থ বুদ্ধিহীনও নয়, হৃদয়হীনও নয়,—অসভ্য অর্থ বিদ্যাহীন। অসভ্যের সমাজ সেই

সমাজ, যাহার প্রতিপুরুষের লোকের জন্য পূর্ব্বপুরুষের ও পূর্ব্বকালের এমন কোনই সঞ্চিত বিদ্যা নাই, যাহা বিশেষ শিক্ষা ভিন্ন আয়ত্ত হয় না। সভ্য-সমাজের লোক ইস্কুল-কলেজে শিক্ষা না পাইলেও বংশানুক্রমের ফলে এবং সামাজিক অবস্থার প্রভাবে মোটামুটী সভ্য সমাজোচিত বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করে; কিন্তু রীতিমত শিক্ষা না পাইলে অতি বড় পণ্ডিতবংশের প্রতিভাবান্ সন্তানও মূর্খই থাকিয়া যায়। কেননা বিদ্যার বংশানুক্রম নাই। সকল রকম্ বিদ্যাই প্রতি যুগের লোককে নূতন করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। এবং এই ক্রমাগত নূতন চেষ্টার ফলেই মনুষ্যসমাজের লব্ধ বিদ্যা প্রালব্ধ না হইয়াও রক্ষিত হয়। যদি পৃথিবীর একপুরুষের সমস্ত লোক একবার সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা হইতে বিরত থাকে, তবে মানুষের আদিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সঞ্চিত সমস্ত বিদ্যা ও সভ্যতা একপুরুষেই লোপ পায়, এবং মানুষকে আবার প্রাচীন বর্ব্বরতায় কাঁচিয়া বসিয়া সভ্যতার পুনর্গঠন আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারটা একেবারে অকিঞ্চিৎকর জিনিস নয়। ইহার অর্থ—মানুষের বহুযুগের চেষ্টার ফলে অর্জ্জিত সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়া, অসভ্য অন্তত ন-সভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টলব্ধ প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করা।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিতে হইলে একবারে অনেকটা গোড়ার কথা ধরা ছাড়া উপায় নাই।

শিক্ষা ও সভ্যতা

(৪)

মানুষের সভ্যতা অতি প্রাচীন। সচরাচর কথাবার্ত্তায় আমরা এই প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ করি, ইহা তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রাচীন। প্রাচীন সভ্যতার কথা উঠিলেই আমরা বৈদিক, ব্যবিলন, বা মিশরের সভ্যতার কথা তুলিয়া এমন ভাবে কথা কই, যেন ঐগুলি মানব-সভ্যতার আদিম অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল সভ্যতা অতি সুপরিণত এবং মানুষের সভ্যতার প্রথম অবস্থা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অনেক বিষয়ে ঐ সকল সভ্যতা যেস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতা সেদিকে আর বড় বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। এই কথা মনে না থাকায় আমরা যাহাকে আধুনিকতা বলি, প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হই, এবং এই সকল সভ্যতা হইতেও বহু প্রাচীন অথচ পরিপুষ্ট সভ্যতার বিবরণ আবিষ্কার হইলে আমরা অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করি।

মানুষের এই সুপ্রাচীন সুপরিণত সভ্যতা মানুষ যে সম্পূর্ণ অসভ্যতার হাত হইতে ক্রমশঃ উদ্ধার করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই, এবং বর্ত্তমানের অতি সুসভ্য মানুষ যে অতীতের নিতান্ত অসভ্য আদিম মানুষেরই বংশধর তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। মানুষ যে অসভ্যতা হইতে ক্রমশঃ সুসভ্যতায় উপনীত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে বড় একটা সংশয় নাই।

তাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছেন যে, ইহা ইভলিউশনের ফল। ইহার অর্থ কেবলমাত্র এই নয় যে, মানুষের সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে; কেননা এই ক্রমবিকাশের কথা ত অল্প-বিস্তর ঘটনারই বিবৃতি, তাহার ব্যাখ্যা নয়। এই ইভলিউশনবাদের সম্পূর্ণ অর্থ টা এই যে, যে নিয়মে অতি নিম্ন-শ্রেণীর জীবদেহ হইতে পৃথিবীতে অতি উচ্চশ্রেণীর জীব-শরীর ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া প্রাণতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ঠিক সেই নিয়মেই মানুষের সভ্যতা অতি নীচ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উচ্চ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই মতটা খুব জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন এবং সেই প্রচারের কাজটা এতই সাফল্য লাভ করিয়াছে যে, যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পেন্সারের লেখার সহিত কোনও পরিচয় নাই, তাঁহাদেরও এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এবং বোধ হয় এই মতটা পোষণ করা আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াই শিক্ষিত-সমাজে গণ্য ও মান্য। কিন্তু মতটা আগাগোড়া মিথ্যা। পৃথিবীতে জীবশরীরের ক্রমবিকাশের নিয়মের সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই। এই দুই ব্যাপারের নিয়ম ও প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক, এবং পৃথক বলিয়াই অসভ্য শিশুকে শিক্ষা দিয়া সুসভ্য মানুষ করা সম্ভব হয়, এবং পৃথক বলিয়াই সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা এতটা স্থান জুড়িয়া আছে। যদি সত্যই

Organic Evolution-এর নিয়মে মানবসভ্যতার বিকাশ হইত তাহা হইলে মানুষের জীবনে শিক্ষার কোনও স্থান থাকিত না; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতালব্ধ সমস্ত বিদ্যা শিশুর মনে আপনিই স্ফুরিত হইত এবং যে হতভাগ্যের হইত না স্বয়ং ফ্রোবেলও সারাজীবন শিক্ষা দিয়া তাহাকে বর্ণ পরিচয় করাইতে পারিতেন না।

Organic Evolution-এর মূলে আছে Heredity। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন, উদরসর্ব্বস্ব জীবাণু হইতে যে পৃথিবীতে ক্রমে মানুষের জন্ম হইয়াছে ইহার গোড়ার কথা এই যে, জনক জননীর দেহের ও মনের ধর্ম্ম সন্তানে সংক্রমিত হয়। ফলে যখন জনক জননীর শরীরে বা মনে নূতন কিছুর আবির্ভাব হয় তখন তাহাদের সন্তান, অন্বয়ানুসারে সেই নূতনত্ব লাভ করে। যদি জীবন-সংগ্রামে এই নূতন কিছুর দ্বারা কোনও সুবিধা হয় তবে যাহাদের সেটা আছে তাহার সাহায্যে সেই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে এবং বংশ রাখিয়া যায়, বাকীগুলি নির্ব্বংশ হইয়া মরে। এবং এইরূপে যুগের পর যুগ নানা বিভিন্ন অবস্থায় নূতনত্বের উপর নূতনত্ব পুঞ্জীভূত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়হীন এক Cell-এর জীব হইতে পশুপক্ষী ও মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। এই হইল Organic Evolution সম্বন্ধে পণ্ডিতদের আধুনিক মত।

কেমন করিয়া জীব-শরীরে এই নূতনত্বের আবির্ভাব হয় এবং কোন্ জাতীয় নূতনত্ব Organic Evolution-এর

প্রধান ভিত্তি, এ সম্বন্ধে ত্রিশ বছর পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা যতটা একমত ও নিঃসংশয় ছিলেন এখন আর তেমন নহেন। তখনও ডারুউইনের প্রচারিত ব্যাখ্যাই সকলে মান্য করিতেন। ঐ ব্যাখ্যা অনুসারে জনক জননীর সহিত সন্তানের যে সব ছোটখাটো জন্মগত বিভিন্নতা প্রতিদিনই দেখা যায়, যাহার ফলে ছেলেটা বাপের মত হইয়াও ঠিক তাহার মত হয় না, সেই নিত্যসিদ্ধ নূতনত্বই ইভলিউশনের প্রধান সহায়। আর এক সহায়, প্রত্যেক প্রাণীর জীবনকালের মধ্যে বাহিরের চাপে ও ভিতরের চেষ্টায় তাহার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। কিন্তু ডারুউইনের এই মতের আসন এখন টলিয়াছে। এখন পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যে নূতনত্বের উপর ভর করিয়া unicellular জীব মানুষে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা প্রতিদিনকার আটপৌরে নূতনত্ব নয়। প্রাণীর শরীরে মাঝে মাঝে অতি দুর্জ্ঞেয় কারণে হঠাৎ এক একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। যদি তাহাতে জীবনযুদ্ধের কোনও সহায়তা হয় তবে ত কথাই নাই, অন্তত পক্ষে যদি নিতান্ত বিপত্তিকর না হয় তাহা হইলেই ঐ পরিবর্ত্তনটী স্থায়ী হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরই মত যে এই সকল হঠাৎ-উপস্থিত বড় রকমের নূতনত্বই Organic Evolution-এর প্রধান কারণ। প্রতি প্রাণীর জীবদ্দশায় বাহিরের প্রকৃতির চাপে ও ভিতরের শক্তির প্রয়োগে তাহার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হয় সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা

এখন বলিতেছেন যে, ঐ জাতীয় পরিবর্ত্তন সন্তান-সন্ততিতে মোটেই সংক্রমিত হয় না। প্রাণীর শরীরে দুই রকমের মাল-মশলা আছে। এক শ্রেণীর মালমশলায় তাহার শরীর গঠিত হয়, দ্বিতীয় রকমের মালমশলা বংশরক্ষার জন্য সঞ্চিত থাকে। বাহিরের চাপে বা ভিতরের চেষ্টায় যে পরিবর্ত্তন তাহা ঐ প্রথম শ্রেণীর মালমশলাতেই আবদ্ধ থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মালমশলা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়া যায়। ফলে ঐ স্বোপার্জ্জিত পরিবর্ত্তন সন্তান-সন্ততির নিকট পৌঁছে না। যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল-মশলায় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, সেই পরিবর্ত্তনই বংশানুক্রমে চলে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ এখন পর্য্যন্তও একেবারেই অজ্ঞাত। এবং জীবশরীরে যে সকল হঠাৎ বড় বড় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া Organic Evolution-কে ধাপে ধাপে টানিয়া তুলিয়াছে তাহার কারণ এই দ্বিতীয় রকমের মালমশলায় পরিবর্ত্তন।

এই ত গেল সংক্ষেপে Organic Evolution-এর নিয়ম-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বর্ত্তমান মত। এখন ইহার সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সম্পর্কটা কি? মানুষের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত কিছুই ত মানুষের শরীরে দাগ কাটে না, বিশেষত শরীরের সেই মালমশলাগুলিতে যাহার উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে। এগুলি বাহিরের বস্তু। মানুষ এগুলিকে আবিষ্কার করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা এক পুরুষের শরীর হইতে আর এক পুরুষের শরীরে সঞ্চারিত হয় না। এক পুরুষের মানুষ পরের পুরুষের মানুষকে এগুলি সঞ্চিত

ধনের মত দান করিয়া যায়। ইহারা মানুষের heredity নয়, inheritance। এগুলির বংশানুক্রম নাই, আছে উত্তরাধিকার। এবং এ ধনের উত্তরাধিকারী একমাত্র অঙ্গজ নয়, সমগ্র মানব সমাজ।

তারপর ডারুউইনের Survival of the fittest নিয়মেরও এখানে কোনও প্রভাব নাই। সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ ফল তাহার দ্বারা জীবনসংগ্রামে কোনও কাজই হয় না। Bionomial theorem আবিষ্কার করিয়া Newton-এর জীবনযাত্রার এবং বংশরক্ষার যে কোন সুবিধা হইয়াছিল, ইহা তাঁহার জীবনচরিত লেখকেরা বলেন না, এবং যাঁহারা ঐ তত্ত্বটী আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তাঁহারা যে নির্ব্বংশ হন নাই ইহাও নিশ্চিত। কাব্য রচনার ফলে জীবনযুদ্ধে জয়লাভের কতটা সুবিধা হয় সে সম্বন্ধে দেশী বিদেশী ভুক্তভোগী কবিদের আত্মোক্তির অভাব নাই, এবং অকবি লোকও যে সংসারে টিঁকিয়া থাকে এবং বংশরক্ষা করিয়া তবে মরে তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

এ কথা সত্য যে, মন ও ইন্দ্রিয়ের যে-সব শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, ঐ শক্তিগুলি Organic Evolution-এরই ফল। মানুষের বুদ্ধি, প্রতিভা, কল্পনা, ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মানুভূতি এগুলি যে জন্মগত ইহা ত প্রতিদিন চোখেই দেখা যায়। এবং ঐ শক্তিগুলিই যে জীবনযুদ্ধে মানুষের সহায় হইয়া তাহাকে পৃথিবীর রাজাসনে বসাইয়াছে তাহাও স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু ঐ শক্তিগুলিকে যে-সব কাজে লাগাইয়া

মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা Organic Evolution-এর চোখে একবারে বাজে খরচ, সম্পূর্ণ অপব্যবহার। Organic Evolution-এর ফলে মানুষ লাভ করিল তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, যেন শিকারের ও শিকারীর মৃদু পদশব্দটিও কাণে না এড়ায়, মানুষ সেই সুযোগে গড়িল সঙ্গীত-বিদ্যা। ইভলিউশনে মানুষ পাইল দশ আঙ্গুলের সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি, যেন তাহার তীরের লক্ষ্যটা একেবারে অব্যর্থ হয়; সে বসিয়া গেল তাঁত পাতিয়া মলমল বুনিতে, আর তুলি ধরিয়া ছবি আঁকিতে। ইভলিউশন মানুষকে দিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর কল্পনা যেন সে নানা ফিকিরে শরীরটাকে ভাল রকম বাঁচাইয়া বংশটা রাখিয়া যাইতে পারে, মানুষ গড়িয়া তুলিল কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন। ইভলিউশনে মানুষের কণ্ঠে আসিল ভাষা—যাহাতে তাহার পক্ষে দলবদ্ধ হওয়া সহজ হয়, মানুষ সৃষ্টি করিয়া বসিল—ব্যাকরণ আর অলঙ্কার। মোট কথা মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে প্রাণের ঘরের চোরাই মাল মনের কাজে খরচ করিয়া। প্রাণের ঘরকন্নার জিনিস মনের বিলাসে ব্যয় করার নাম সভ্যতা।

মানুষের এই তহবিল তছরুপের একটা ফল এই যে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি Organic Evolution-এ যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছিল সেই খানেই থামিয়া আছে। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে এই সকল শক্তির কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। প্রাচীন গ্রীক অপেক্ষা যে নবীন ফরাসীর বুদ্ধি ও রূপজ্ঞান অধিক তাহার কোন প্রমাণ নাই, এবং বৈদিক যুগের হিন্দুর

অপেক্ষা আমাদের মানসিক শক্তি যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এমন কথা কি সবুজপন্থী কি সনাতনপন্থী কেহই বলিবেন না। তবে প্রাচীন কালের তুলনায় বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যজনক বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতের যাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বর্ত্তমানের শিশুরাও তাহা হাতে খড়ির পরেই শেখে। তাহার কারণ সভ্যতা বাড়ে টাকার স্থদের মত। এক যুগের মানুষ যাহা সৃষ্টি করে, পরের যুগের মানুষ শিক্ষার সাহায্যে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া আবার তাহার উপর নূতন সৃষ্টির আমদানি করে,—এই রকমে প্রাচীন সৃষ্টির উপর নবীন সৃষ্টি জমা হইয়া মানুষের সভ্যতা বাড়িয়া চলে। প্রাচীন যুগে যাঁহারা সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মানসিক শক্তি যে আমাদের চেয়ে কিছু কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল যে অনেক বিষয়ে আমাদের কাছে খুব সামান্য বোধ হয় তাহার কারণ আমরা পাইয়াছি তাহার পরের শত যুগের চেষ্টার পুঞ্জীভূত ফল। এবং আমরা যে নূতন সৃষ্টি করি তাহা এই বহুযুগের সৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়া। এই জমান সভ্যতার পুঁজি যে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর খোয়া যায় না তাহা নয়; তখন আবার মানুষকে কাঁচিয়া আরম্ভ করিতে হয়। এবং বুনিয়াদী ঘরের জমান টাকার মতই ইচ্ছা করিলে কিছুমাত্র না বাড়াইয়া দুই এক পুরুষেই ইহাকে ফুঁকিয়া নিঃশেষ করিয়াও দেওয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের বেশী দূরে যাইতে হইবে না।

(৫)

Organic Evolution-এর রাজ্যে বিদ্রোহী হইয়া তাহার রাজ্য লুটিয়া আনিয়া, মানুষ যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফল সঞ্চিত হইয়াছে সাহিত্যে, কলায় এবং বিবিধ বিদ্যায়। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এইগুলির সহিত মানুষের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এই সকল বিদ্যা ও কলা অতীতের নিকট হইতে বর্ত্তমানের উত্তরাধিকার। শিক্ষার লক্ষ্য এই উত্তরাধিকারে মানুষকে অধিকারী করা। কেননা এ ত কোম্পানীর কাগজের দান নয় যে ঘরে বসিয়া সুদ পাওয়া যাইবে। এ হইল কষ্টে গড়া ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার। কাজ শিখিয়া চালাইতে পারিলে তবেই লাভের সম্ভাবনা।

সভ্যতার এই ফলগুলি শিক্ষার দ্বারা মানুষকে আয়ত্ত করান যায়, কেননা যে শক্তির প্রয়োগে ইহাদের সৃষ্টি সে শক্তি অল্প-বিস্তর মানুষ জন্ম হইতেই লাভ করে। সেই জন্য অসভ্য সমাজের শিশুও শিক্ষা পাইলে সভ্যসমাজের ছেলের মতই সভ্যতার বিদ্যাগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারে। ইহার পরীক্ষা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সভ্যসমাজের ছেলেকেও শিক্ষা পাইয়াই এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচিত হইতে হয়। কেননা বিদ্যা ত মানসিক শক্তি নয়, উহা মানসিক শক্তির সৃষ্টি এবং সহস্র যুগের মানব-প্রতিভার সমবেত সৃষ্টি। প্রকৃতি যাহার কপালে প্রতিভার তিলক পরাইয়াছেন, যে কেবল সভ্যতার সৃষ্টিগুলিকে নিজস্ব করিতে পারে তাহা নয়, তাহার

উপর নিজের সৃষ্টিও যোগ করিতে পারে, তাহাকেও এই শিক্ষার দ্বার দিয়াই সভ্যতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কেননা এমন প্রতিভার কল্পনা করা যায় না, যাহা সভ্যতার কোনও সৃষ্টিকে আবার প্রথম হইতে একাই গড়িয়া তুলিতে পারে। প্রাচীন সৃষ্টির উপর দাঁড়াইয়াই তবে নূতন সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে আর একটা মত প্রচলিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞলোকের পাণ্ডিত্যের ফল নয়। সংসারের চাকা বর্ত্তমান যুগের মানুষ ও জাতির হৃদয় পিষিয়া এই মতটা নিংড়াইয়া বাহির করিয়াছে। মতটা হইল এই যে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা, যেন সে টিঁকিয়া থাকিয়া বংশরক্ষা করিয়া যাইতে পারে। এই মতটার আবির্ভাব মানব-সভ্যতার একটা tragedy। ইহা মনের উপর প্রাণের প্রতিশোধ। প্রাণের ঘরে ডাকাতি করিয়া মানুষ মনের ভোগের জন্য সভ্যতা গড়িয়াছে। কিন্তু ইহার দু'একটা সৃষ্টিকে আবার প্রাণের কাজে লাগাইতে গিয়া জীবনযাত্রাটা এমনই জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ প্রাণ রাখিতে যে কেবল প্রাণান্ত হইতেছে তাহা নয়, একেবারে মনান্ত হইতেছে। মনের যা কিছু শক্তি ও ক্ষমতা এক প্রাণ রাখার কাজেই ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া কোনও লাভ নাই। যাহা জীবন হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছে কেবল মত দিয়া তাহাকে চাপা দেওয়া চলে না। এ হইল

ভিড়ের ভিতর ঠেলার মত; ব্যাপারটা কেহ পছন্দ করে না, কিন্তু পিছু হটিবারও কাহারও সাধ্য নাই।

বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে হয় তো এই জটিলতার হাত এড়ান অসাধ্য। এবং হয় তো বাধ্য হইয়াই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার্থীকে জীবন-যুদ্ধের জন্য তৈরী করাটাই শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাণের দাবীর সুর যখন খুব চড়া হইয়া ওঠে তখন আর সব ফেলিয়া সেই দিকেই কাণ দেওয়া ছাড়া গতি নাই। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়াও না মনে করি যে এই বিসদৃশ ব্যাপারটাই হইল সভ্যতার উন্নতি। এ ভুলের আশঙ্কা আছে। কেননা মন আর ইন্দ্রিয়ের যে শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়াছে, আজ জীবনযাত্রার জটিলতায় সেই সব শক্তির উপরেই প্রাণ তাহার একাধিপত্যের দাবী পেশ করিয়াছে। ফলে মানুষের বুদ্ধি, কল্পনা, প্রতিভা ব্যয় হইতেছে অনেক, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য কেবল প্রাণ বাঁচান ও জাত বাঁচান। ইহা সভ্যতা নয়, এ হইল সভ্যতা যে পথে চলে তাহার একবারে বিপরীত পথ। প্রাণের কাজে যাদের প্রথম প্রকাশ, মনের ভোগে তাদের শেষ পরিণতি হইল সভ্যতা। প্রাণের ব্যাগারে সমস্ত মনটাকেই নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অসভ্যতা না হইতে পারে কিন্তু সভ্যতা নয়।

ফাল্গুন, ১৩২৩
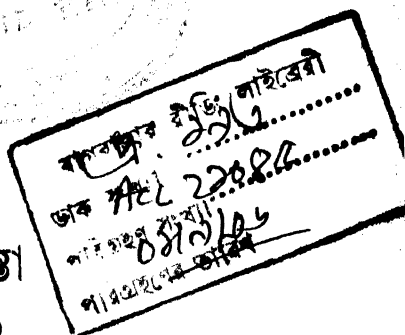
অন্নচিন্তা

(১)

আমাদের বৈশেষিকেরা বলেছেন অভাব একটী পদার্থ। এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকলে কি আর তাঁদের চোখে পরমাণু ধরা পড়ে! আজ এই ঘোরতর অন্নাভাবের দিনে, অভাব যে একটা অতি কঠিন পদার্থ তাতে কে সন্দেহ করে? অথচ এই তত্ত্বটী প্রাচীন আচার্য্যেরা জেনেছিলেন যোগবলে। কেননা সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যে অন্নাভাব ছিল না সে বিষয়ে একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একমত, আর বিলাতী সভ্যতাই যে দেশের সমস্ত রকম অভাবের মূল, অর্থাৎ ঐ সভ্যতার আমদানীর পূর্ব্বে যে দেশে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না, এ তো আমাদের সকলেরই জানা কথা। সুতরাং কি ঘরে কি বাইরে, কোনও স্থানেই বৈশেষিক আচার্য্যেরা অভাবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে তাঁরা যে তত্ত্বটী প্রচার করেছেন সেটী পুরাণের ভবিষ্যৎরাজবংশাবলীর মত, আর সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মত সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।

কুতার্কিক লোকে হয়তো এইখানে তর্ক তুল্‌বেন যে, বৈশেষিকেরা যে অভাবকে পদার্থ বলেছেন সে অভাবের অর্থ কেবল negation। আর পদার্থ মানে বস্তু নয়, বিলাতী দর্শনে যাকে বলে category তাই। এবং এই তত্ত্বটীর অর্থ মাত্র এই যে অভাব বা negation মনন-ব্যাপারের অর্থাৎ thought-এর একটা necessary ক্যাটিগরি। কিন্তু এই তর্ক আর কিছুই নয়, এ হ'ল হিন্দু-দর্শনের পবিত্র মন্দিরেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ঘটিয়ে তার জাত মার্‌বার চেষ্টা। নিশ্চয় জানি, কোনও খাঁটি হিন্দু এ সব তর্কে কাণ দেবেন না। সুতরাং এ তর্কের উত্তর দেওয়া নিস্প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ছিল না তার একটী অতি নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। মাধবাচার্য্য তাঁর সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ছোট বড় সমস্ত রকম দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। একটি পাণিণিদর্শনের বর্ণনা আছে, যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে ব্যাকরণ-শাস্ত্রই পরম পুরুষার্থের সাধন; ঐ শাস্ত্রে পারদর্শী না হ'লে সংসার-সাগর পারের আশা দুরাশা এবং ঐ শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ। এমন কি একটী রসেশ্বর-দর্শন আছে, যাতে যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণেই প্রতিপাদিত হ'য়েছে যে রস বা পারদই পরব্রহ্ম। রসার্ণব, রসহৃদয় প্রভৃতি প্রামাণিক দার্শনিক গ্রন্থ থেকে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে; এবং রসজ্ঞেরা শুনে খুসি হবেন, যে শ্রুতি-প্রমাণটী আহৃত হ'য়েছে সেটী তাঁদের সুপরিচিত "রসো বৈ

সঃ রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি” এই শ্রুতিবাক্য। এমন পুঁথিতেও অন্নদর্শন বলে’ কোনও দর্শনের বিবরণ দূরে থাক নাম পর্য্যন্ত নেই। এ থেকে কেবল এই অনুমানই সম্ভব যে, প্রাচীনকালে এদেশে অন্নাভাব না থাকায় অন্নচিন্তাও ছিল না, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে একবারে চিন্তার অভাবেই এ বিষয়ে কোনও দর্শনের উদ্ভব হয়নি। কেননা ও-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা থাক্‌লে যে তার একটা দর্শনও থাকৃত, তাতে বোধ হয় যে প্রমাণ দেখিয়েছি তারপর আর কোনও বুদ্ধিমান লোকে সন্দেহ করবেন না। এবং আমার এই যুক্তিটী যে সম্পূর্ণরূপে ‘বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী সম্মত’ তাও নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের উচ্চাসন একবার গ্রহণ করেছি তখন কোনও সত্যই গোপন করলে চলবে না। অপ্রীতিকর হ’লেও সমস্ত কথাই প্রকাশ করে’ বল্‌তে হবে! অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে যে দেশে অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না এ বিষয়ে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের প্রমাণ অকাট্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে খুব প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগে কিছু কিছু অন্নাভাব ছিল। কেননা শ্রুতিতে অন্ন সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। এর বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ধরুন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বরুণের উপাখ্যান। বরুণের পুত্র ভৃগু যখন পিতার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করলেন তখন

বরুণ তাঁকে বলেন তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়, তুমি তপস্যা কর। তবে সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটা 'ফর্‌মুলা' বলে' দিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। তপস্যা করে' ভৃগু জান্‌লেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই সকলের জন্ম হয়, জন্মের পর অন্নের বলেই সকলে বেঁচে থাকে, অন্নের দিকেই সকলের গতি এবং শেষে অন্নেই সবাই লীন হয়, অতএব অন্নই ব্রহ্ম। ভৃগু এই জ্ঞানটুকু লাভ করে' পিতার কাছে গেলে বরুণ তাঁকে আবার তপস্যা কর্‌তে বল্‌লেন। দ্বিতীয়বার তপস্যায় ভৃগুর বোধ হ'ল প্রাণই ব্রহ্ম। এই রকমে তৃতীয়বারে জান্‌লেন মনই ব্রহ্ম। চতুর্থ বারে বুঝ্‌লেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। অবশেষে শেষবার তপস্যায় এই জ্ঞানে পৌছিলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। এই হ'ল ভৃগু-বরুণের গল্প, যাকে বলে 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা'। এই শ্রুতি সম্বন্ধে শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা নানা তর্ক তুলেছেন, 'পঞ্চকোষ বিবেক' ও ঐ রকম সব দুর্ব্বোধ্য জটিলতার অবতারণা করেছেন কিন্তু এর প্রকৃত অথচ সহজ ইঙ্গিতটি কেউ ধর্‌তে পারেন নি। এই উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এই নয় যে গোড়ায় অন্ন থাক্‌লে তবেই শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়! ইহাই যে শ্রুতির প্রকৃত মর্ম্ম ও শিক্ষা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, এবং একটু বিচার করে' দেখ্‌লে বোধ হয় পাঠকেরও কোনও সন্দেহ থাক্‌বে না। কেননা উপাখ্যানটী শেষ করে'ই শ্রুতি চারটী পরিচ্ছেদে কেবল অন্নেরই প্রশংসা করেছেন। এবং

তার মধ্যে এমন সব শ্রুতি আছে যাতে যে-কোনও 'ইকনমিষ্টের' প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করে' উঠ্‌বে। প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে উপাখ্যানটি পড়্‌লেই বিংশশতাব্দীর জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোতে ওর প্রকৃত অর্থটা স্পষ্ট ধরা পড়ে ; এবং শঙ্কর প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকেরা কেন যে ওর যথার্থ মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন নি তার কারণও সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। পূর্ব্বেই প্রমাণ করেছি যে ঐ সব দার্শনিকদের সময়ে কোনও অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না। এবং তাঁদের যে কোনও historical sense বা 'ঐতিহাসিক অনুভূতি' ছিল না তা যাঁর ঐ sense বিন্দুমাত্র আছে তিনিই জানেন। সেইজন্য বৈদিক সময় যে তাঁহাদের সময়ের চেয়ে কিছুমাত্র অন্য রকম ছিল এটা তাঁরা কল্পনাই করতে পার্‌তেন না। ফলে বর্ত্তমান কালে আমরা যে higher criticism বা 'উচ্চতর অঙ্গের সমালোচনার' বলে প্রাচীনকালের মনের কথাটা একবারে ঠিকঠাক বুঝে' নিতে পারি, শঙ্কর প্রভৃতির সে সামর্থ্য ছিল না। অবশ্য ঐ সমালোচনা-প্রণালীর নামের higher বিশেষণটা যাঁরা ও-প্রণালীটা প্রবর্ত্তন করেছেন তাঁরাই দিয়েছেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বিনয়কে উপেক্ষা কর্‌বার মত সৎসাহস তাঁদের সকলেরই ছিল।

যা হোক পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার ফলে এটা বেশ জানা গেল যে বৈদিক সময়ের পরে আর অন্নচিন্তায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বড় মাথা ঘামান নি। তাঁরা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং কামসূত্রেরও অনাদর করেন নি, কিন্তু মাঝখান থেকে অন্নসূত্রটা

একেবারে বাদ দিয়েছেন। এর ফলভোগ কর্‌ছি আমরা, তাঁদের এ যুগের বংশধরেরা। আমাদের অন্নের অভাব অত্যন্ত বেশী, এবং কিসে ও-বস্তুটার কিছু সংস্থান হয় তার একটা মোটামুটী রকম মীমাংসারও বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু বহুযুগের বংশানুক্রমিক অনভ্যাসের ফলে ও-সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা কর্‌তে গেলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন আমরা কে যে কি বলি তার কিছু ঠিক থাকে না। সেইজন্য আমাদের বাঙ্গলা-দেশে দেখা যায়, যিনি আইনের বিদ্যা ও বক্তৃতা বেচে টাকা জমিয়েছেন, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর ছেলেকে ইস্কুল-কলেজে বৃথা সময় নষ্ট না করে' চট্‌পট্‌ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যেতে খুব জোরাল বক্তৃতা দেন। অবশ্য সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলধনের জন্য তাঁর জমান টাকার কোনও অংশ পাওয়া যাবে না, কেন না তাঁর যে বংশধর ওকালতি কর্‌বে কিন্তু উপার্জ্জন কর্‌বে না তার জন্য সেটা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত দরকার। এবং বলা বাহুল্য, যে শিল্প-বাণিজ্যে না ঢুকে' লেখাপড়া শিখে' চাকুরী খুঁজে বেড়ায় বলে' বাঙ্গলার যুবকেরা লেখায় ও বক্তৃতায় হিতৈষীদের গঞ্জনা শুন্‌ছে, সেই শিল্প ও বাণিজ্য দেশের কোথায় যে তাদের জন্য অপেক্ষা করে' বসে' আছে সেটা তাদের দেখান কেউ প্রয়োজন মনে করি নে। ভাবটা এই যে না-ই বা থাকুল বাঙ্গালীর ছেলের মূলধন, না-ই বা থাকুল দেশে তাদের জন্য কোনও শিল্প-বাণিজ্য, তারা কেন প্রত্যেকেই বিনা মূলধনে আরম্ভ করে' নিজের চেষ্টায় এক একটা শিল্পের বড় বড় কারখানা

গড়ে' তোলে না, বড় রকম ব্যবসার মালিক হ'য়ে বসে না। কেননা কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও লোক যে কদাচিৎ ঐ রকম ব্যাপার করেছে, তা ত পুঁথিতেই লেখা আছে। তারপর আমাদের এই অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য ইস্কুল-কলেজ সব তুলে' দিয়ে সে জায়গায় কৃষিপরীক্ষাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায় সে বিষয়ে কেউ যুক্তি-তর্ক দেখান; আর যাঁরা কাজের লোক তাঁরা যে-হয় কোনও ছেলেকে, যা-হোক কিছু একটা শিখে' আস্‌বার জন্য, যে একটা হোক বিদেশে যাওয়ার জাহাজ-ভাড়া সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করাতে আরম্ভ করেন। আর এ যুগের বাঙ্গালীর ছেলেও হয়েছে এক অদ্ভুত জীব। বর্ত্তমানে ধনে-জনে যে জাতি পৃথিবীর মাথায় বসে' আছেন শোনা যায়, বুকের মধ্যে তাঁদের হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিতে হ'লে তাঁদের গায়ের জামার অংশবিশেষের ভিতর দিয়েই তার সোজা, এবং মন্দ লোকে বলে একমাত্র পথ। বাঙ্গালীর ছেলের অবস্থাটা ঠিক উল্টো। নিজের পকেট সম্বন্ধেও খুব বেশী সজাগ ও উৎসাহান্বিত কর্‌তে হ'লে, এদের একেবারে বুকের মধ্যে ঘা না দিলে কোনই ফল পাওয়া যায় না। দেশী শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া যে দেশের ধনবৃদ্ধির ও ধনরক্ষার জন্য একটা 'টারিফের' প্রাচীর মাত্র, 'পলিটিক্যাল্ ইকনমি' নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক এবং মহাজনের খাতার হিসাব-নিকাশেরই বিষয়, তা এরা কিছুতেই বুঝ্‌তে চায় না, এবং বুঝ্‌লেও তাতে কোনও ফল হয় না। এরা চায় গান আর কবিতা যার

বিষয় হচ্ছে দেশের উত্তরের হিমালয়ের মাথার বরফের মুকুট, দক্ষিণের নীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, এবং যখন সমস্ত পৃথিবী মূক ছিল তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু সরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন, সেই কাহিনী। অথচ এরা যে হাতে কলমে কাজে লাগ্‌তে পারে না বা কাজ উদ্ধার কর্‌তে পারে না, এমন নয়। এরা অর্দ্ধোদয়-যোগে দেশের দীন-তমকেও নারায়ণের পূজায় সেবা করে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গেই করে ; বন্যার জলে চালের বস্তা পিঠে নিয়ে সাঁতার দেয়, এবং কোনও 'ডিপার্ট্‌মেণ্টের' বিনা চালনায় অনুষ্ঠানটী যেমন করে' নির্ব্বাহ করে, তাতে কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যাদের গর্ব্বের প্রধান বিষয়, সেই 'ডিপার্ট্‌মেণ্টের' কর্ত্তাদেরও কতক বিস্ময় কতক সন্দেহের উদ্রেক হয় ; জাতির একটা দুর্নাম ঘোচাবার জন্য এরা তুর্কীর গুলিতে টাইগ্রিসের তীরে প্রাণ দিতে রাজী হয়, এবং তার শিক্ষানবীশিতে পূব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না। কিন্তু এ ত অতি স্পষ্ট যে এ সকলই কেবল ভাবের খেলা, এর মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা কিছুই নেই। প্রকৃত কাজের বেলায় এদের চরিত্রে কোনও গুণই দেখা যায় না। এরা কিছুতেই উপলব্ধি করে না যে খুব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ করে', সংসারযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে দশের এক হওয়াই সব চেয়ে বড় কাজ, চরিত্রের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। সেইজন্য যদিও বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার পুঁথিতে এদের সেই সব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান হয় যাঁরা খুব হীন

অবস্থা থেকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের সদ্ব্যবহারে নিজেদের অবস্থা খুব বেশীরকম ভাল করেছিলেন ; এবং ইংরেজী হাতের লেখা লিখ্‌তে আরম্ভ করে'ই সময় আর টাকা যে একই জিনিষ 'কপিবুক' থেকেই এরা সে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করে, তবুও কিছু বড় হ'লেই এই পুস্তকস্থা-বিদ্যার ফল এদের স্বভাবে কিছু দেখা যায় না। তখন বাল্যশিক্ষার পুঁথির মহাজনদের অনুরূপ যে সব কৃতকর্ম্মা পুরুষ, সমাজে সশরীরেই বর্ত্তমান এরা তাঁদের কোনও খবরই রাখে না, এমন কি তাঁরা দেশের রাজার কাছে খুব উচু সম্মান পেলেও নয়। যারা কেবল কথার সঙ্গে কথা গাঁথ্‌তে পারে, বা লজ্জাবতীর পাতায় তামার তার জড়ায়, এরা তাদের নিয়েই অসঙ্গত রকম হৈ চৈ করে। অন্নচিন্তায় যে এরা কাতর নয়, কি অন্নচেষ্টা যে এদের উত্তেজিত করে না তা নয়। সে চিন্তায় এরা যথেষ্টই ক্লিষ্ট ; সে চেষ্টায় এরা অনেক দুঃখ, অনেক অপমানই সহ্য করে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও ঐ চিন্তা আর ঐ চেষ্টাকেই পরমোৎসাহে সমস্ত মন দিয়ে বরণ করে' নিতে কিছুতেই এদের মন সরে না। এদের ভাব কতকটা এই রকম যে রোগ যখন হয় তখন ডাক্তারও ডাক্‌তে হয়, ঔষধও গিল্‌তে হয় এবং হাঙ্গামও কিছু কম হয় না। এবং যে চিররোগী, সমস্ত জীবনই বাধ্য হ'য়ে তাকে এই হাঙ্গাম সইতে হয়। কিন্তু তাই বলে' রোগের চিকিৎসাকেই সব চেয়ে বড় উৎসাহের ব্যাপার করে' তোলা সম্ভবপর নয়।

শিক্ষা ও সভ্যতা

আমরা বাঙ্গলা দেশের ছেলে বুড়ো অন্নচিন্তার ব্যাপারে সবাই যে এই সব আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক কাণ্ড করি, পূর্ব্বেই বলেছি এতে আমাদের দোষ কিছু নেই। দোষ পূর্ব্বপুরুষদের যাঁরা ও-সম্বন্ধে সুচিন্তা ও মনের কোন স্বাভাবিক ঝোঁক রক্ত-মাংসের সঙ্গে আমাদের দিয়ে যেতে পারেন নি। এই দায়িত্ব-হীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও সুরু করেছি। কেননা জানি, বেফাঁস কথা যা কিছু বল্‌ব তাতে আমার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই। দায়ী সেই পিতৃপুরুষেরা যাঁরা পিণ্ডের আশা করেন কিন্তু পিণ্ডের অন্ন সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হ'য়ে চিন্তা কর্‌বার মতন মনের বা মগজের অবস্থা নিজেদের না থাকায় আমাদেরও দিয়ে যেতে পারেন নি।

(২)

দেশের প্রাচীন আচার্য্যেরা যখন অন্ন সম্বন্ধে চিন্তাই করেন নি, তখন সে চিন্তায় কিছু সাহায্য পেতে হ'লে পশ্চিমের আধুনিক যবনাচার্য্যদের কাছেই যেতে হয়। এঁদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা অন্ন-জিজ্ঞাসারই একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে' তুলেছেন। কিন্তু অন্ন সম্বন্ধে যিনি সব চেয়ে ব্যাপক অথচ গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন তিনি এই অন্ন-শাস্ত্রের শাস্ত্রী নন, তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ্‌ আচার্য্য, নাম চার্লস্‌ ডার্‌উইন। ভৃগু-বরুণ প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে অন্নতত্ত্বের এক ধাপ উপরে উঠ্‌লে পাই প্রাণতত্ত্ব। সুতরাং প্রাণতত্ত্বজ্ঞ

ডার্‌উইন যে তাঁর উপরের ধাপ থেকে অন্নের লীলা ব্যাপকতর ও স্পষ্টতর ভাবে প্রত্যক্ষ কর্‌বেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ডার্‌উইন পূর্ব্বাচার্য্যদের কাছ থেকেই অন্নপ্রাণ-বিদ্যার এই বীজমন্ত্রটী পেয়েছিলেন যে পৃথিবীতে যত প্রাণী জন্মে তাদের সকলের প্রাণরক্ষার উপযোগী পর্য্যাপ্ত অন্ন বসুমতী যোগাতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন মন্ত্রই বহু বৎসর ধরে' একান্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সংযমের সঙ্গে জপ কর্‌তে কর্‌তে পূর্ব্বে যা কারও ভাগ্যে ঘটে নি তাঁর সেই সিদ্ধি লাভ হ'ল। অন্ন তাঁর অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ ডার্‌উইনকে দেখালেন। তিনি দেখ্‌লেন স্থলে, জলে, আকাশে—অরণ্যের ছায়ায়, মরুভূমির প্রান্তে, গাছের শাখায়, পর্ব্বতের গহ্বরে, সমুদ্রের তলে, হ্রদের বুকে—অন্নের জন্য প্রাণের এক অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্ন পরিমিত, তার আকাঙ্ক্ষী জীব সংখ্যাহীন। এই পরিমিত অন্নকে আয়ত্ত করার জন্য প্রাণীতে প্রাণীতে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে প্রাণীতে যে দ্বন্দ্ব, তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন। এ দ্বন্দ্বে কেহ কারও সহায় নয়। এ হ'ল সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনও প্রকাশ হচ্চে প্রকাশ্য যুদ্ধের রক্তোচ্ছ্বাসে, কখনও নিঃশব্দে চলেছে নীরব রক্তশোষী প্রতিযোগিতার আকারে। কোন্‌টা বেশী ভয়ানক বলা কঠিন। অন্ন তাঁর মোহিনী মূর্ত্তিতে প্রাণকে আকর্ষণ করেছেন, আর আকৃষ্ট প্রাণীকে মহাকালের মূর্ত্তিতে সংহার কর্‌ছেন। শেষ পর্য্যন্তও যাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি রাখ্‌ছেন সেই ভাগ্যবানদের সংখ্যা অতি সামান্য। মৃত্যুর

মরুভূমির উপর দিয়ে অন্ন তাঁর সম্মোহন শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের জোয়ারে দুকূল ছাপিয়ে উঠ্‌ছে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস দু'পাশের তপ্ত বালুতেই শুষে' নিচ্ছে। প্রাণের একটা অতি ক্ষীণ ধারা কোনও রকমে শেষ পর্য্যন্ত অন্নের পিছনে পিছনে চলেছে।

অন্নের এই মোহিনীমহাকালের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করে' ডারউইন কাল জয় করে' অমর হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে অন্নের লীলার এখানেই শেষ নয়। প্রাণের ধারা চল্‌তে চল্‌তে একদিন মানুষে এসে ঠেক্‌ল। পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশ হ'তে হ'তে একদিন তা মানুষের মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ হ'ল। কেমন করে' হ'ল সে কথা পণ্ডিতদের তর্ককোলাহলে অপণ্ডিত সাধারণের কাণে আসা দুঃসাধ্য; তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার যে বিগ্রহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হ'ল, সে বিগ্রহ অতি মনোরম, অতি বিস্ময়কর। তার সুঠাম, সরল, উন্নত দেহ, তার বন্ধনহীন মুক্ত বাহু, তার সতেজ ইন্দ্রিয়, তার সবল, অনাড়ষ্ট মাংসপেশী সবই যেন স্পষ্ট করে' বলে' দিল যে এ বিগ্রহ অরণ্যে পড়ে' থাক্‌বার নয়, এর জন্য একদিন সোণার দেউল গড়া হবেই হবে। তবুও প্রাণের এই প্রকাশের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার তার এই মূর্ত্তি নয়। তার চেয়েও লক্ষগুণে আশ্চর্য্য এক ব্যাপার সংঘটিত হ'ল। যে মন বোধ হয় পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রারম্ভের সঙ্গেই তার সাথে ছিল, অতি ক্ষীণ অদৃশ্যপ্রায় অবস্থা থেকে নানা মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে

ক্রমে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছিল, মানুষের মূর্ত্তিতে পৌঁছে সে একবারে দীপ্ত সূর্য্যের মতন জ্বলে' উঠ্‌ল। তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মানুষ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখ্‌ল যে এ বিপুল ধরিত্রী তারি রাজত্ব।

অন্ন তাঁর নিজের শক্তি সেইদিন পূর্ণরূপে উপলব্ধি কর্‌লেন যেদিন এই মানুষও, রাজটীকা ললাটে নিয়ে, কাঙালের মত তাঁর পিছু পিছু পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল। একটা ফলের জন্য দশটা গাছের তলায়, একটা শিকারের খোঁজে এক অরণ্য হ'তে আর এক অরণ্যে ঘুরে ঘুরে, পরে অন্নকে কিছু সুলভ করে' একটু সুস্থির হওয়ার চেষ্টায় গোটাকয়েক প্রাণীকে যদি পোষ মানাল, তবে সেই প্রাণীরূপ অন্নের অন্ন খুঁজ্‌তে এক দেশ হ'তে আর এক দেশে চল্‌তে চল্‌তে তার পায়ে ব্যথা ধরে' উঠ্‌ল। এই অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ দৈন্যে মানুষের বহু যুগ কেটে গেল। শেষে এক দিন পরম শুভক্ষণে ক্লান্তদেহ, ক্ষুব্ধচিত্ত মানুষ বলে' উঠ্‌ল আর অন্নের আশায় তার পিছু পিছু ঘুরে' বেড়াব না,— অন্নকে সৃষ্টি কর্‌ব, স্বল্প অন্নকে বহু কর্‌ব। সেদিন নিশ্চয়ই স্বর্গের তোরণে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছিল; দিব্যাঙ্গনারা মর্ত্ত্যচক্ষুর অদৃশ্য হেমঘটে অভিষেকবারি এনে মানুষের মাথায় ঢেলেছিলেন; ইন্দ্রদেব এসে সোণার রাজমুকুট তার মাথায় পরিয়েছিলেন; আর সমস্ত আকাশ ঘিরে দেবতারা প্রসন্ন নেত্রে দীর্ঘ বনবাসের পরে মানুষের নিজ রাজ্যে অভিষেক চেয়ে দেখেছিলেন।

কৃষি আরম্ভ হ'ল। প্রাণের ধাপ থেকে মনের ধাপে উঠে মানুষ দেখ্‌ল যে এখানে দাঁড়ালে অন্ন এসে আপনিই হাতে

ধরা দেয়, তাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াতে হয় না। এখানে বসে' তপস্যা কর্‌লে কালো মাটীর বুক চিরে সোণার ফসল বাইরে এসে পৃথিবী ঢেকে ফেলে; দিনের অন্ন দিন খুঁজে প্রাণান্ত হ'তে হয় না। মানুষ জান্‌ল, 'পৃথিবী বা অন্নম্', পৃথিবীই অন্ন। মাটীর তলে জলের অফুরন্ত ধারার মত মাটীর মধ্যে অন্নেরও অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান আছে; লাঙ্গলের ফালে তাকে তুলে আন্‌তে জান্‌লে অন্নের দৈন্য দূর হয়; যে মন্ত্র ডার্‌উইন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার শক্তিকে ব্যর্থ করা যায়। মাটীর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হ'ল। মাটীর টানে উদ্ভ্রান্ত বনচারী গৃহী হ'ল। সেইদিন মানুষের স্বদেশ, সমাজের প্রতিষ্ঠা হ'ল, মানুষের গ্রাম নগর গড়ে' উঠ্‌ল, শিল্প বাণিজ্যের সুরু হ'ল। পৃথিবীর আদিম অরণ্য কেটে সভ্যতার সোণার মন্দিরে মানুষের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

কিন্তু প্রাণের ভূমি থেকে আরম্ভ করে' মানুষের এই যে যাত্রা, এখানেই তার শেষ হয় নাই। মন যখন সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিমিত অন্নকে বহু করে' অন্নের দাসত্বের লোহার বেড়ি মানুষের পা থেকে খুলে নিল, বিরামহীন অন্নচেষ্টা থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখনই মানুষের স্বভাবের যেটি পরমাশ্চর্য্য অংশ, সেটির বিকাশ হ'ল। মানুষ দেখ্‌ল যে কেবল অন্নে তার তৃপ্তি নাই,—তার পরিমাণ যতই অপর্য্যাপ্ত হ'ক, তার প্রকার যতই বিবিধ হ'ক। প্রাণের তাড়নায় অন্নের খোঁজে আকাশ, বাতাস, পৃথিবীকে জান্‌তে আরম্ভ করে' মানুষ বুঝ্‌ল যে তার

স্বভাবে একটা কি আছে যেটা কেবল জানার দিকে তাকে ঠেলে দেয়। অন্নের সৃষ্টি আরম্ভ করে' সে জান্‌ল যে তার প্রকৃতির যেটা অন্তরতম অংশ, সেটা কেবল সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে' যেতে চায়। মানুষ যেন প্রাণিরাজ্যের রাজা হ'লেও অপ্রাণ-লোকেরই অধিবাসী। সে যেন বিদেশী রাজপুত্র পরদেশে এসে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরাত্মার নাড়ীর টান স্বদেশের দিকেই। প্রাণের জগতে মানুষের এই যে উদ্দেশ্যহীন জানা আর অনাবশ্যক সৃষ্টি তাই হ'ল তার বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য, কলা, শিল্প। মানুষের প্রাণ বলে' এদের মূল্য এক কানা কড়িও নয়; তার অন্তর জানে এরাই তার যথাসর্ব্বস্ব, অন্নের চেয়েও কাম্য, প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্ন আর প্রাণের ভূমি থেকে মনের সিড়ি দিয়ে বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনী। এই লোকে পৌঁছিলেই অন্নের দাসত্ব থেকে মানুষের যথার্থ মুক্তি। মানুষ যদি কেবল অন্নকে আয়ত্ত ক'রেই নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারৃত তা হ'লে অন্ন-দাস হ'লেও মানুষের জীবনে তার সর্ব্বব্যাপী প্রভুত্বের কোনও অপচয় হ'ত না। সোনার শিকলে অন্নকে বাঁধ্‌লেও শিকলের অন্য দিকটা মানুষের গলাতেই পরান' থাকৃত, অন্নের টানে পৃথিবীময় না ঘুরৃতে হ'লেও সারাক্ষণ অন্নকে টেনেই পৃথিবীতে চল্‌তে হ'ত। এই বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে পৌঁছিতে জান্‌লেই মানুষের গলা থেকে এই অন্নের শিকল খোলার উপায় হয়।

আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন। এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।

(৩)

যদি কারু মনে হয় যে মনের বলে মানুষের আয়ত্ত হ'য়ে, তাকে বিজ্ঞান আর আনন্দের পথের যাত্রী দেখে, মানব-জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে', অন্ন চিরদিনের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে, তবে তিনি অন্নের প্রভাব এবং মাহাত্ম্যের কথা কিছুই জানেন না। মানুষের সভ্যতার যে যে মুক্তির কথা বলেছি সে হ'ল শাস্ত্রে যাকে বলে জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ দেহও আছে, মুক্তিও হয়েছে। সুতরাং মানুষের দেহ আর প্রাণ যখন আছে তখন তার অন্নের উপর একান্ত নির্ভর আছেই আছে। এই ছিদ্র ধরে' অন্ন অতি নিপুণ সেনাপতির মত এক নূতন পথ দিয়ে তার বল চালনা করে' মানুষকে বন্দী কর্‌বার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন দ্বন্দ্বটা চলেছে, কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তনে 'ষ্ট্র্যাটেজির' প্রভেদ ঘটেছে মাত্র।

যতদিন মানুষ কেবল প্রাণী ছিল, তার মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি, বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের বার্ত্তা তার অজ্ঞাত ছিল, ততদিন অন্নের দৃষ্টি ছিল মানুষের প্রাণের উপর। যেমন ইতর প্রাণীকে তেমনি মানুষকেও নিজের রথের চাকায় বেঁধে, অন্ন তার জীবন-মৃত্যুর উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌ত। এই যুদ্ধে অন্ন জয়ী

হয়েছিল নিজেকে বিরল করে', আপনাকে দুর্লভ করে'। মানুষের মন যখন অন্নকে বহু ও সুলভ করে' এই উপায়টা ব্যর্থ করল সেইদিন থেকে অন্নের দৃষ্টি পড়েছে মানুষের বিজ্ঞান ও আনন্দ-লোকের দিকে। অন্ন জানে যে ওরাই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের জীবনে যদি ওদের আবির্ভাব না হ'ত, তা হ'লে নামে প্রভু হ'লেও রোমের শেষ সম্রাটদের মত মানুষ দাস-অন্নের দাসত্বই করত। কাজেই অন্নের এখন চেষ্টার বিষয় হ'য়েছে মানুষের সভ্যতার ঐ বিজ্ঞান আর আনন্দের লোকটা ধ্বংস করা। আর প্রাণকে আয়ত্ত করার প্রাচীন চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যেই অন্ন এই নূতন যুদ্ধের অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে। দুর্লভ অন্নকে বহু করে' মানুষ সভ্যতা গড়েছে। এই বহু অন্ন অসংখ্য মোহিনী মূর্ত্তিতে মানুষকে ঘিরে তার বিজ্ঞান আর আনন্দলোকের পথরোধের চেষ্টা করছে। বিরলতার ক্ষয়রোগে মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংস করতে না পেরে বাহুল্যের মেদরোগে তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা বন্ধ করবার চেষ্টা দেখছে। অন্ন এখন মহাকালের মূর্ত্তি ছেড়ে কুবেরের মূর্ত্তি ধরেছে। মানুষের কত সভ্যতা মহাকালের করাল দংষ্ট্রা হ'তে উদ্ধার পেয়ে স্থূলোদর ভোগপ্রসন্নমুখ কুবেরের মেদপুষ্ট বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে মরেছে!

মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অন্নের এই দ্বন্দ্ব নূতন নয়, এ দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দ্বন্দ্বেরও আরম্ভ হ'য়েছে এবং বোধ হয় শেষ পর্য্যন্তই চলবে। কখনও সভ্যতা

জয়ী হ'য়েছে, কখনও বা অন্নেরই জয় হ'য়েছে। মানুষে মানুষে শেষ যুদ্ধের বর্ত্তমান কল্পনার মত এ যুদ্ধের শেষ কল্পনাও হয়ত কেবল স্বপ্ন। হয়ত মানুষের সভ্যতাকে চিরদিনই এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ে' চল্‌তে হবে।

এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের সভ্যতা রক্ষা পেয়েছে, কেননা যুগে যুগে এমন সব জাতি উঠেছে যারা অন্নের মায়াকে অতিক্রম করে' আনন্দের পথে চল্‌তে পেরেছে। ভুল হ'তে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আধুনিক বাঙ্গালী সেই সব জাতির অন্যতম। সভ্যতার এই প্রাচীন যুদ্ধে নবীন সেনাপতি হবার যোগ্যতা এদের মধ্যে আছে। অন্নের মহাকাল-মূর্ত্তিতে ভয় পেয়ে যাঁরা এই জাতিকে কুবেরের কোলে তুলে' দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান, তাঁদের মাথায় বুদ্ধি থাক্‌তে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টির অভাব। আনন্দলোকের সূর্য্যরশ্মি বিজয়মাল্যের মত এদের মাথায় এসে পড়েছে; হিতৈষিদের শত চেষ্টাতেও সে বরণকে উপেক্ষা করে' কেবল অন্নকে বহু করার চেষ্টাতেই এ জাতি কখনও জীবন উৎসর্গ কর্‌তে পার্‌বে না।

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"; অন্নের নিন্দা করি নে। "অন্নং বহুকুর্বীত"; অন্নকে বহু করার যে কত প্রয়োজন তাও জানি। সেই ভিত্তির উপরেই মানুষের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সমস্যা এই, কেমন করে' অন্নকেও বহু করা যায় আবার তার বাহুল্যকেও বর্জ্জন করা যায়। মহাকালের দশনেও ছিন্ন হ'তে না হয়, কুবেরের গদাও চূর্ণ না করে।

অন্নচিন্তা

এস নূতন যুগের নবীন বাদরায়ণ! 'অথাতোঽন্ন জিজ্ঞাসা' বলে' তোমার অন্নসূত্র আরম্ভ করে' এই সংশয়ের সমাধান কর। কোন্ মধ্যযান পথের পথিক হ'লে মানুষের সভ্যতাকে আর আনন্দের ব্রহ্মলোক হ'তে ফিরে আস্‌তে না হয় তার নির্দ্ধারণ কর।

আশ্বিন, ১৩২৪

রোম।

(১)

জোর করে' লেগে থাকৃলে দেখ্ছি অসাধ্যও সাধন করা যায়। এভ্রিম্যানের অনুবাদে চার ভ্যলুম মম্সেনের রোমের ইতিহাস শেষ হ'য়ে গেল। অবশ্য এ পুঁথির শেষে পৌছে দেখি গোড়ার দিক্কার অনেক কথা, মনের মধ্যে ঝাপ্সা হ'য়ে এসেছে। কেল্টজাতির স্বাধীনতা রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার করুণ কাহিনী, স্যাম্নাইটদের রোমের নাগপাশ থেকে মুক্তির বৃথা প্রয়াসের ইতিহাসকে একরকম ঢেকে ফেলেছে। সিরাজের জয়ধ্বনিতে, হ্যানিবালের স্তুতিগানও প্রায় ডুবে গেছে। সন তারিখের ত কথাই নাই। প্রথম থেকেই তার গোলযোগ সুরু হয়েছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সব একাকার হয়ে গোলযোগের সম্ভাবনারও লোপ ঘটেছে। মোট কথা, রোমের ইতিহাসে পরীক্ষা দিতে বস্লে যে, সে পরীক্ষাতে ফেল হব এটা নিশ্চয়। তবুও ল্যাটিন জাতির বিজয় যাত্রার এই অধ্যায়গুলি, মম্সেনের বর্ণনায় মনের মধ্যে যে দাগ কেটে গেছে, তা সহসা মুছে যাবে না। ভূ-মধ্য-সাগরের চার পাশের যে ভূ-খণ্ডকে আধুনিক যুগের রোমের ঐতিহাসিকেরা ও পৃথিবী বলেই উল্লেখ করেন, তার বহু রাজ্য ও

বিচিত্র জাতিগুলির উপর রোমের এক-রাট্ ও একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মনকে যে দোলা দিয়েছে, তার বেগ শেষ হ'তে কিছু সময় লাগ্‌বে।

পাঠকেরা শঙ্কিত হবেন না। মম্‌সেন থেকে দুটো অধ্যায় ইংরেজি অনুবাদের বাঙ্গলা তর্জ্জমা করে' দিয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকপদ লাভের কোনও চেষ্টাই কর্‌ব না। রোম সম্বন্ধে এখানে যা কিছু বল্‌তে যাচ্ছি তা নিতান্তই এলোমেলো রকমের। তাতে প্রত্ন-তত্ত্বের পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাসের গাম্ভীর্য্য—এ দু'য়ের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং যাঁরা প্রবন্ধের নাম দেখে পড়্‌তে সুরু করেছেন তাঁরা হয়ত আর অগ্রসর না হ'লেই ভাল কর্‌বেন। আর যাঁরা নাম দেখেই পাতা উল্টে যেতে চাচ্ছেন, তাঁরা একবার শেষ পর্য্যন্ত পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও কর্‌তে পারেন।

(২)

প্রাচীন হিন্দুজাতি এবং তাদের সভ্যতা আমাদের পশ্চিমের মাষ্টার ম'শায়দের কাছে অনেক রকম গঞ্জনা শুনেছে। তিরস্কারের একটা প্রধান বিষয় এই যে বংশপরিচয়ে তাঁরাও ছিলেন রোমানদেরই জ্ঞাতি। সুতরাং সেই একই রক্ত শরীরে থাক্‌তে তাঁরা যে কেমন করে হিন্দু-সভ্যতার মত এমন দুর্ব্বল ও বিকৃত সভ্যতা গড়ে' বস্‌লেন, এটা পণ্ডিতদের মনে যেমন বিরাগেরও সঞ্চার করেছে তেম্‌নি জিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে। এবং এই সংশয়ের সমাধানে তাঁরা নানা রকম সম্ভব অসম্ভব,

অবশ্য সকলগুলিই 'বৈজ্ঞানিক', মতবাদের প্রচার করেছেন। গল্প আছে, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস্ রয়েল সোসাইটীর নতুন প্রতিষ্ঠা করে' পণ্ডিতদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, মাছ মর্‌লেই ঠিক সেই সময়টা তার ওজন বেড়ে যায় কেন? পণ্ডিতেরা উত্তর খুঁজে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে গেলেন। অবশেষে একজন বল্লেন, আচ্ছা দেখাই যাক্ না ওজন করে', মাছটা মর্‌লেই তা যথার্থ বেশী ভারী হ'য়ে ওঠে কিনা। মম্‌সেনের বিপুলায়তন পুঁথি শেষ করে' এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে, যে যাঁরা এই রোমান-সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাকে অতি খাটো ও নিতান্ত হাল্কা বলেছেন, 'সভ্যতা' বল্‌তে তাঁরা কি বোঝেন? সভ্যতার কোন্ মাপকাটিতে তাঁরা এই দুই সভ্যতাকে মাপ করেছেন? কোন্ তৌলে এদের ওজনে তুলেছেন? এই যে রোমান-সভ্যতা, যার গৌরবের দীপ্তিতে পণ্ডিতদের চোক ঝল্‌সে গেছে, এ ত একটা একটানা পরের দেশ জয় ও অন্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস। প্রথম 'লেশিয়ামের' উপর রোমের প্রভুত্ব বিস্তার, তারপর তারি সাহায্যে উত্তরের ইট্রাস্‌কানদের ধ্বংস করে' ইতালীর আর সকল জাতিগুলোকে পিষে ফেলে গোটা দেশটায় নিজের আধিপত্য স্থাপন। আবার মেডিটারেনিয়ানের ওপারের প্রবল রাজ্যটী, সিসিলির সেতু পার হ'য়ে এই আধিপত্যের কোনও বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কাতেই কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বিজিত ইতালীর সাহায্যে তাকে সমূলে উচ্ছেদ; এবং কার্থেজের

অধিনায়ক 'হ্যামিলকার বার্কা' বা বিদ্যুতের বংশধর, স্পেন থেকেই যাত্রা সুরু করে' বজ্র হ'য়ে রোমের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল বলে', শত্রুর শেষ রাখ্তে নাই এই নীতি অনুসারে স্পেনেও রাজ্যবিস্তার। এম্নি করে' দক্ষিণ আর পশ্চিমের ভাবনা যখন ঘুচ্ল তখন স্বভাবতই দৃষ্টি গেল পূবের দিকে। গায়ে জোর থাক্লে এ 'আশঙ্কার' ত আর শেষ নাই! পূবে তখন ছিল আলেক্জেণ্ডারের ভাঙ্গা সাম্রাজ্যের গোটা কয়েক বিচ্ছিন্ন টুক্রা। ওরি মধ্যে যে দুটি একটু প্রবল—ম্যাসিডন আর এসিয়া, তারা তখন রোমেরই মত আশপাশের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে' নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল। এ ব্যাপারকে অবশ্য উপেক্ষা কি মার্জ্জনা কিছুই করা চলে না। কেননা পরের দেশ জয় করে' রাজ্য ও বলবৃদ্ধি জিনিসটি মানুষের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতিরই নিজের পক্ষে খুব সুসঙ্গত ও অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্য সকলের বেলাই নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে' মনে হ'য়েছে। সুতরাং বাধ্য হ'য়েই রোমকে এ দুটি রাজ্য আক্রমণ কর্তে হ'ল; এবং এদের বাহুল্য অংশগুলি ছেঁটে ফেলে যাতে এরা অতঃপর বেশি নড়াচড়া না করে' ভদ্রভাবে জীবন যাপন কর্তে পারে, তার ব্যবস্থা কর্তে হ'ল। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে রোম একটা মহানুভবতার পরিচয় দিতেও কসুর কর্লে না। ইতালীতে তখন হেলেনিক সভ্যতার স্রোত বইতে আরম্ভ ক'রেছে। তারি গুরুদক্ষিণা হিসাবে গ্রীসের ছোট ছোট

নখদন্তহীন নাগরিক রাজ্যগুলিকে ম্যাসিডনের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করে’ রোম তাদের একবারে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। কিন্তু দুঃখের কথা মহানুভবতার এ খেলাও রোম বেশি দিন খেল্‌তে পারল না! কারণ দানে পাওয়া স্বাধীনতার মানেই হ’ল—স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগটা কর্‌তে হবে দাতারই ইচ্ছা অনুসারে। সুতরাং গ্রীসের চপল প্রকৃতির লোকগুলি যখন নিয়মের ব্যতিক্রম করে’, ম্যাসিডনের আবার মাথা তুল্‌বার চেষ্টা দেখে, তাকেই নায়ক ভেবে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ কর্‌ল, তখন এই পূবের দেশগুলির আধা স্বাধীনতা আধা অধীনতার বিশ্রী অবস্থাটা ঘুচিয়ে সোজাসুজি এদের করায়ত্ত করে’ নেওয়া ছাড়া রোমের আর গত্যন্তর থাক্‌ল না। এর পর রোমান চোখের দিক্‌চক্রবালে যে দুটি রাজ্য বাকী থাক্‌ল, সিরিয়া আর মিশর, তাদের নিয়ে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হ’ল না। অবস্থা দেখে তারা আপনারাই এসে রোমের পায়ে মাথা ঠেকালে। সাম্রাজ্য যখন গড়ে’ উঠ্‌ল তখন কাজে কাজেই তার “বৈজ্ঞানিক চৌহদ্দি”রও খোঁজ পড়্‌ল। কৃষ্ণসাগরতীরের মিথ্‌রেডেটিসএর রোমের শিকল ভেঙ্গে হাত পা ছড়াবার দুরাকাঙ্ক্ষা দমন উপলক্ষে, রাজ্যের পূব-সীমা ইউফ্রেটিসে গিয়ে ঠেক্‌ল, এবং স্বয়ং জুলিয়স কেল্টদের মৃতদেহের উপর দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্রাটেরও আবির্ভাব হ’তে খুব বেশি বিলম্ব ঘটল না। কেননা তিন শ’ বছর রাজ্য—

জয়ে আর রাজ্যভোগে প্রাচীন রোমান বল-বীর্য্য-ঐক্য সকলেরই তখন লোপ হ'য়েছে। প্রকৃতির পরিশোধ! আর পররাজ্যজয়ে যে সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধজয়ী সেনাপতি তার নায়কত্ব না পেলেই বরং বিস্ময়ের কারণ হ'ত। সিজারের উত্তরাধিকারীরা আরও তিন শ' বছর ধরে' এই রোম-সাম্রাজ্য, যাকে কোন রকমেই আর রোমান সাম্রাজ্য বলা চলে না, শাসন ও রক্ষা কর্‌লেন। রাজ্যের সকল জাতির লোকের মধ্যে রোম-নাগরিকের অধিকার ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কেননা তখন সকলেই রোম-সম্রাটের সমান প্রজা, 'ফেলো সিটিজেনের' অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ফেলো সাব্‌জেক্ট'। উঁচু আশা ও বড় আকাঙ্ক্ষার তাড়না না থাকলে যে শান্তি আপনিই আসে, রাজ্যজুড়ে সে শান্তি বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌ল। ঘরকন্নার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পাকা আইন-কানুন এই বহুজাতি ভূয়িষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে গড়ে' উঠ্‌ল। তারপর মানুষের গড়া অপর সকল রাজ্যের মত রোম-সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়্‌ল। ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্র ভূ-মধ্যসাগর ছেড়ে আট্‌লান্টিক মহাসাগরকে আশ্রয় কর্‌ল। তারি তীরে তীরে নবীন সব জাতির মধ্যে মানুষের সভ্যতার চির-পুরাতন ও চির-নূতন খেলার আরম্ভ হ'ল।

(৩)

এই যে ছয় সাত শ' বছরের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের পলিটিক্যাল্ ইতিহাস, রোমান সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনীরও

এই হ'ল অন্তত চোদ্দ আনা। একে বাদ দিলে রোমান সভ্যতার যা অবশিষ্ট থাকে তার গৌরবের কাছে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথা দূরে থাক, তার চেয়ে অনেক ছোট সভ্যতারও মাথা নীচু করার কোনও কারণ দেখা যায় না। হেলেনিক সভ্যতার দৃষ্টান্তটি চোখের সাম্‌নে থাক্‌তে নিজেদের সভ্যতার এই স্বরূপ সম্বন্ধে রোমানদের মনেও সংশয়ের কোনও অবসর ছিল না। আগষ্টাসের সভাকবি তাঁর যুগের আত্মবিস্মৃত রোমানদের প্রকৃত রোমান-গৌরব স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌ছেন,—'জানি আর আর সব জাতি আছে যারা কঠিন ধাতুকে সুষমাময় গড়ন দিতে পারে, পাথরের হিম দেহ থেকে প্রাণের বিপুল উচ্ছ্বাস খুঁড়ে' বের কর্‌তে পারে, জ্ঞানের আঙুল আকাশে তুলে নক্ষত্রলোকেরও সকল বার্ত্তা এঁকে দেখাতে পারে, কথার সঙ্গে কথা গেঁথে লোকের করতালি নিতেও তারা পটু, কিন্তু রোমান, এ সব কাজ তোমার নয়। তোমার কাজ হ'ল—সকল জাতির উপর রাজত্ব করা। সেই হ'ল তোমার শিল্পকলা। তোমার গৌরব হ'ল বিজিত রাজ্যে শান্তি আনা, উঁচুমাথাকে যুদ্ধে নীচু করা, পতিত যে শত্রু তাকে করুণা দেখান।' 'এনিড' যে ইতিহাস নয়, কাব্য, পতিত শত্রুকে করুণা দেখানোর কথা বলে' ভার্জিল বোধ হয় তারি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা রোমের ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এ বস্তুটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যা হোক, ল্যাতিন কবির রোমান সভ্যতা ও গৌরবের এই বর্ণনাটী

আধুনিক কালের রোমানতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এক রকম সকলেই মেনে নিয়েছেন। কারণ না মেনে উপায় নাই। এবং এরি মধ্যে মানুষের সভ্যতা, প্রকৃতি ও শক্তির বিরাট বিকাশ দেখে' তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। মানি, বহু জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় করতে হ'লে জাতির মধ্যে যে বীর্য্য, যে ঐক্য, যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বন্ধনের প্রয়োজন, তার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এই বস্তুকে সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ বিকাশ বললে মানুষের প্রকৃতিকেই অপমান করা হয়। আর জাতির এই বীর্য্য, ঐক্য ও বুদ্ধি যখন পরের দেশ জয় ও পরের উপর আধিপত্যেই নিঃশেষে ব্যয় হয়, তখন তার শক্তি দেখে অবশ্য স্তম্ভিত হ'তে হয়, যেমন কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্ত্তিতে মানুষ স্তম্ভিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একটা সমগ্র জাতি, নবীন শক্তি সঞ্চারের আকস্মিক উন্মাদনায় নয়, কিন্তু যেমন মম্‌সেন দেখিয়েছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী সূক্ষ্ম লাভ লোকসানের হিসাব গণনা করে' চোখের সুমুখে যখনি যাকে প্রবল বা বর্দ্ধিষ্ণু দেখেছে তারি বুকের উপর পড়ে' তার জীবনের বল নিঃশেষে শুষে' নিয়ে নিজেকে পুষ্ট করেছে, রোমান ইতিহাসের এই ব্যাপারটি তার ভীষণতায় মানুষকে স্তম্ভিত না ক'রেই পারে না; খৃষ্টান ও পার্শি পুরাণে যে অন্ধকার ও অমঙ্গলের দেবতার কল্পনা আছে সেটা ভিত্তিহীন নয় বলেই মানুষের বিশ্বাস জন্মায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রোমের এই প্রবল পলিটিক্যাল্ সভ্যতা, কেবল সমসাময়িকদেরই মাথা ভয়ে হেঁট করিয়ে

রাখে নি, কিন্তু উত্তরকালের ঐতিহাসিকদেরও শ্রদ্ধায় নতমুণ্ড করে' রেখেছে। প্রাণতত্ত্ববিদেরা হয় ত বল্‌বেন মানুষ পশুরই বংশধর ; শক্তির বিকাশ দেখ্‌লেই পূজা না করে' থাকৃতে পারে না। মম্‌সেন বলেছেন, এথেন্স যে রোমের মত রাষ্ট্র গড়্‌তে পারে নি, সে জন্য তার দোষ ধরা মূর্খতা। কেননা গ্রীক প্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও যা কিছু বিশেষত্ব, তা ছিল তেমন একটা রাষ্ট্র গড়ে' তোলার প্রতিকূল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে বরণ না করে', গ্রীসের পক্ষে জাতীয় একতা থেকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে পৌছান সম্ভব ছিল না। সেই জন্য গ্রীসে জাতীয় একত্বের যখনি বিকাশ ঘটেছে সেটা কোনও রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর ভর করে' নয়। অলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গন, হোমারের কবিতা, উরিপি-ডিসের নাটক, এই সবই ছিল হেলাসের ঐক্য-বন্ধন। ঠিক আবার তেমনি ফিডিয়াস্‌ কি আরিষ্টফেনিসের জন্ম দেয় নি বলে' রোমকে অবহেলা করা অন্ধতা। কেননা রোম স্বাধীনতার জন্য স্বাতন্ত্র্যকে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্ম্মমভাবে দমন ক'রেছে। ফলে হয়ত ব্যক্তিগত বিকাশের পথ রুদ্ধ হ'য়েছে, প্রতিভার ফুলও মুকুলেই ঝরে' পড়েছে ; কিন্তু তার বদলে রোম পেয়েছে স্বদেশের উপর এমন মমত্ববোধ ও 'পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌', গ্রীসের জীবনে যার কোনও দিন প্রবেশ ঘটে নি। এবং প্রাচীন সভ্যজাতিগুলির মধ্যে রোমই স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হ'য়েছে। সেই জাতীয় ঐক্যের ফলে কেবল বিচ্ছিন্ন হেলিনিক জাতির

উপরে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জানা অংশের উপর প্রভুত্ব, তাদের করতলগত হ'য়েছিল।

আমাদের শাস্ত্রে আছে 'পুরুষের' শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, তাই শেষ, তাই 'পরা গতি'। পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর উপর অবাধ প্রভুত্ব কি মানব-সভ্যতার 'পুরুষ', তার 'কাষ্ঠা' ও 'পরা গতি'! এ প্রভুত্ব ত কালে উঠে কিছুকালের পরই বিলোপ হয়; মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছুই স্থায়ী সম্পদ রেখে যায় না। আমার সুমুখে উরিপিডিসের কয়েকখানি নাটক রয়েছে। এ গুলি ত কেবল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর হেলাসের ঐক্য-বন্ধন নয়। তেইশ শ' বছর আগেকার এথেন্সের নাগরিকের মত আমিও যে আজ সে কাব্যের রসে মেতে উঠ্ছি। এগুলি যে চিরদিনের জন্য মানব-সভ্যতার অক্ষয় মঞ্জুষায় সঞ্চিত হ'য়ে গেছে। যুগের পর যুগ বিশ্বজন এর সুধা আনন্দে পান কর্‌বে। আর রোমের প্রভুত্ব?—সেটি রয়েছে—ঐ মম্‌সেনের পৃষ্ঠায়। এই যে প্রভেদ, এ ত মম্‌সেনের চার ভল্যুমও মুছে ফেল্‌তে পারে না। একে কেবল মানুষের সভ্যতার প্রকার ভেদ বলে' আপোষ মীমাংসার চেষ্টায় কোনও ফল নাই। এর একটির চেয়ে আর একটি শ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ; যেমন জড়ের চেয়ে জীবন শ্রেষ্ঠ, প্রাণের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ।

মানুষের সভ্যতার ধারা দুই। এক ধারা ব'য়ে যাচ্ছে—কেবলই কালের মধ্য দিয়ে—জাতিকে, সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে স্মৃতি ও বিস্মৃতির মহাসাগরে মিশিয়ে দিচ্ছে। নতুন জাতি,

নূতন সভ্যতার স্রোত এসে ধারার প্রবাহকে সচল রাখ্ছে। আর এক ধারা জন্ম নিয়েছে কালেরই মধ্যে, কিন্তু কালকে অতিক্রম করে' ধ্রুবলোকে অক্ষয় স্রোতে নিত্যকাল প্রবাহিত হচ্ছে। নূতন স্রোত এসে এ ধারাকে পুষ্ট কর্ছে; কিন্তু এতে একবার যা মিশছে, তার আর ধ্বংস নেই, তা অচ্যুত। কেননা এ লোকে ত পুরাতন কিছু নেই, সবই সনাতন, অর্থাৎ চির-নূতন। সভ্যতার সৃষ্টির এই যে নশ্বর দিকটা এ কিছু তুচ্ছ নয়। এইখানেই বিবিধ মানবের বিচিত্র লীলা, সমাজ গঠনে, রাষ্ট্র নির্ম্মাণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহত্ত্বে, হীনতায় চিরদিন তরঙ্গিত হ'য়ে উঠ্ছে। হোক্ না এ মৃত্যুর অধীন, তবুও জীবনের রসে ভরপূর। কিন্তু মানুষ ত কেবল জীব নয়। সে যে মর অমরের সন্ধিস্থল। মৃত্যুর পথে যাত্রী হ'য়েও সে অমৃতলোকেরই অধিবাসী। তাই তার সৃষ্টির যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা কালের অধীন নয়। তার ইতিহাস আছে কিন্তু তা ঐতিহাসিক নয়। সেখানে যে ফুল একবার ফোটে তার প্রথম দিনের গন্ধ সুষমা চিরদিন অটুট থাকে; যে ফল একবার ফলে, রসে আস্বাদে তা চিরদিন সমান মধুর।

দুই সভ্যতার যদি শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা কর্তে হয়, তবে মানুষের সভ্যতার এই অক্ষয় ভাণ্ডারে কার কতটা দান, তাই হ'ল বিচারের প্রধান কথা। এ মাপকাটিতে মাপ্লে, রোমান সভ্যতা গ্রীক কি হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে এক ধাপে দাঁড়াতে পারে না। তাকে নীচে নেমে দাঁড়াতে হয়। যতদিন তার

সাম্রাজ্য ছিল, ততদিন তার বলের কাছে—সবারই মাথা নীচু করে' থাকৃতে হ'য়েছে। কিন্তু উত্তর কালের লোকেরা কেন তার কাছে সম্ভ্রমে নতশির হবে? তাদের জন্য ত সে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করে' রেখে যায় নি। তার যা প্রধান দাবী, তার পলিটিক্যাল্ শক্তি ও বুদ্ধি, তার পাওনা ত তার সমসাময়িকেরা এক রকম ষোল আনাই মিটিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে সে দাবীর জোর খুব বেশি নয়। তার গৌরবের চৌদ্দ আনা হ'ল তার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস জীবনের কাহিনী হ'লেও জীবন নয়, কেবলই কাহিনী। তার পৃষ্ঠার সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। একজন ফরাসী পণ্ডিত রোমানদের দার্শনিক আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সেগুলি এখন বক্তৃতা-শিক্ষার ইস্কুলের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধের মত মনে হ'লেও যাদের জন্য সে গুলি লেখা হয়েছিল তাদের জীবনে ওর প্রভাব ছিল খুব বেশি। সুতরাং এ সব দার্শনিকের মূল্য বুঝতে হ'লে সেই সময়কার রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সে সব মিলিয়ে পড়্তে হবে। হায় রোম, তোমার দার্শনিক চিন্তারও ইতিহাসের হাত থেকে মুক্তি নাই!

(৪)

রোমের পলিটিক্যাল্ গৌরবের গুণগান মুখে যতই কেন থাকুক না, রোমান সভ্যতার এই প্রকৃতিটি পণ্ডিতদের মনে অস্বস্তির সঞ্চার না করে' যায় নি। সেই জন্য য়ুরোপের বর্ত্তমান

সভ্যতা, রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কাছে কেমন করে' কতটা ঋণী, মম্‌সেন তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং ছোট বড় মাঝারি সকল পণ্ডিতই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে ব্যাখ্যার প্রধান কথাটা এই—রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীর যদি বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জাতিগুলির অসভ্যকল্প পূর্ব্বপুরুষদের ঠেকিয়ে না রাখ্‌ত, তবে তারা যখন রোম সাম্রাজ্যের উপরে পড়ে' তাকে ধ্বংস করেছিল, সে ঘটনাটি ঘট্‌ত আরও চার-শ' বছর আগে। এবং তা হ'লে বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে,—স্পেনে, গলে, ড্যানিউবের তীরে তীরে, আফ্রিকায়, হেলেনিক সভ্যতার নব সংস্করণ মেডিটারেনিয়ন সভ্যতা যে শিকড় বসাতে সময় পেয়েছিল, তা আর ঘটে' উঠ্‌ত না। আর তার ফল হ'ত এই যে, ঐ অর্দ্ধ-সভ্য জাতিগুলি ঐ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা গড়ে' তুলেছে, তা কখনই গড়্‌তে পার্‌ত না।

মানুষের ইতিহাসে যে ঘটনাটা এক রকমে ঘটে গেছে, সেটা সে রকম না ঘটে' অন্য রকম ঘট্‌লে তার ফলাফল কি হ'ত এ তর্ক নিরর্থক। তাতে 'স্বপ্নলব্ধ' ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং রোম সাম্রাজ্যকে তার চৌকিদারির প্রাপ্য প্রশংসাটা নির্ব্বিবাদেই দেওয়া যাক্। কিন্তু এ ত' রোমান সভ্যতার কোনও গৌরবের কাহিনী নয়! এবং রোম সাম্রাজ্যকে যাঁরা চার-শ' বছর ধরে' রক্ষা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মুখ চেয়ে তা করেন নি! আর এটাও যদি গৌরবের কথা হয় তবে রোমকে আরও একটা

গৌরবের জন্য পূজা দিতে হয়। সে হচ্ছে ঠিক সময়ে সাম্রাজ্যের প্রাচীরকে রক্ষা করতে না পারা। কেন না রোম যদি আরও চার-শ' বছর সাম্রাজ্যকে অটুটই রাখতে পারত, তবে ত আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা আরও চার-শ' বছর পিছিয়ে যেত এবং হয় ত সে সভ্যতা আর তখন গড়েই উঠতে পারত না! ইতিহাসে তার ওজন কত, সেটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মাপ নয়।

এই যে চার-শ' বছর ধরে' পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশে বিচিত্র সব জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে এল তার ফলে সৃষ্টি হ'ল কি? মেডিটারেনিয়ন সভ্যতার এই প্রকাণ্ড শূন্যতা, সমস্ত পলিটিক্যাল্ সভ্যতা,—রাজ্য-জয় ও রাজ্য-শাসনের সভ্যতার উপর একটা বিস্তৃত ভাষ্য। বিস্তীর্ণ বাগানের চার পাশে পাথর দিয়ে বেড় দেওয়া হ'ল পাছে আকস্মিক বিপৎপাতে বাগান নষ্ট হয়। পাথরের দেয়াল খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকল, কিন্তু বাগানে ফুলও ফুটল না, ফলও পাকল না।

(৫)

রোমান সভ্যতার এই যে উচ্চ জয়গান, এ যে কেবল মিথ্যা স্তুতি তা নয়, এর কলরোল পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলির মন চিরদিন বিপথের দিকেই টানবে। যেই যখন শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে তারই মনে হবে মানুষের বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে' পৃথিবীর যতটা অংশের উপর পারা যায়, নিজের আধিপত্যের একরঙা তুলিটা বুলিয়ে নেওয়া কেবল স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নয়, সভ্যতায়

শ্রেষ্ঠত্ব লাভেরই পথ। এ যে অতিশয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ মম্‌সেন থেকেই তুলে দিচ্ছি। সিজারের গল বিজয়ের বর্ণনা মম্‌সেন এই বলে' আরম্ভ করেছেন—'যেমন মাধ্যাকর্ষণ ও আর আর পাঁচটা প্রাকৃতিক নিয়ম যার অন্যথা হবার যো নেই তেমনি এ'ও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যে জাতি রাষ্ট্র হ'য়ে গড়ে' উঠেছে সে তার অ-রাষ্ট্রবদ্ধ প্রতিবেশী জাতিগুলিকে গ্রাস কর্‌বে, এবং সভ্যজাতি, বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন তার প্রতিবেশিদের উচ্ছেদ কর্‌বে। এই নিয়মের বলে ইতালীয় জাতি (প্রাচীন জগতের একমাত্র জাতি যে শ্রেষ্ঠ পলিটিক্যাল্ উন্নতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা মেশাতে পেরেছিল, যদিও শেষ বস্তুটির বিকাশ তাতে অপূর্ণ ভাবে এবং কতকটা বহিরাবরণের মতই ছিল) পূবের গ্রীকদের, যাদের ধ্বংসের সময় পূর্ণ হ'য়ে এসেছিল, তাদের করায়ত্ত কর্‌তে, এবং পশ্চিমের কেণ্ট জার্ম্মাণদের, যারা সভ্যতার সিঁড়ির নীচের ধাপে ছিল, তাদের উচ্ছেদ সাধন কর্‌তে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল।'

প্রাকৃতিক নিয়ম যে কেমন করে' অধিকারে পরিণত হয় সে রহস্যের চাবী হয়ত হেগেলের 'লজিকে'ও মিল্‌বে না। সে যাই হোক্ এ 'নিয়ম' ও 'অধিকারের' মুস্কিল এই যে এর জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সারাক্ষণ নখদন্ত বের করেই থাক্‌তে হয়। কেননা মল্লাঙ্গনই হচ্ছে এ 'অধিকার' প্রমাণের একমাত্র স্থান। কারণ বুকের উপর চেপে বস্‌তে পার্‌লেই প্রমাণ হ'ল যে চেপে বসার অধিকার আছে; আর তাই হ'ল এ অধিকার প্রমাণের

একমাত্র শাস্ত্রীয় প্রথা। তারপর শক্তি থাক্‌লেই যখন 'অধিকার' আছে, তখন শক্তির পরীক্ষার অধিকার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা চলে না। পরীক্ষা না কর্‌লে ত শক্তিটা ঠিক আছে কিনা তা আগে থেকে অমনি জানবার উপায় নেই। শেষ পর্য্যন্ত ফেল হ'লেও "হলে" ঢোকার অধিকার অস্বীকার করা যায় কেমন করে'? গেল চার বছর ধরে' এই পরীক্ষাটা সারা য়ুরোপ জোড়া চল্‌ছে। মম্‌সেনের সৌভাগ্য যে বেঁচে থেকে তাঁর প্রণালীর ফলটা দেখে যেতে হয় নি। কিন্তু প্রাচীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর, আধুনিক জার্ম্মাণির উপর মুখ বাঁকানোর তাঁদের কোনও অধিকার নেই। কার্থেজ ও মিশর বিজয় যদি রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলজিয়মকে গ্রাস করা জার্ম্মাণির পক্ষে অগৌরবের কিসে? আজকার পলিটিক্সে যা হীন, কালকার ইতিহাসে তা মহৎ হয় কোন্ ন্যায়ের জোরে?

এই যে পলিটিক্যাল্ শক্তি ও সভ্যতার স্তুতিগান—এ মূলে হ'ল একটা 'মায়া'। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন মায়ার প্রকৃতি 'অধ্যাস,'—একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করা। পৃথিবীর আদিযুগ থেকে যখন জাতিতে জাতিতে লড়াই চলে' আস্‌ছে আর কোন 'লীগ অব নেশনে'-ই তা শেষ হবে বলে' যখন বোধ হয় না, (কেননা 'লীগের' একটা অর্থ হচ্ছে এর ভিতরে যারা আস্‌বে না তারা শত্রু, আর বাইরে যাদের রাখা হবে তাদের এজমালীতে দমন করা চল্‌বে) তখন জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি তার

আত্মরক্ষার পক্ষে অমূল্য। জাতির প্রাণই যদি না বাঁচে তবে তার মনের বিকাশও কাজে কাজেই বন্ধ হয়। কিন্তু এই শক্তি যখন আত্মরক্ষায় নয়—পর-পীড়নেই রত থাকে, রক্ষার চেষ্টায় নয়—ধ্বংসের লীলাতেই মেতে ওঠে তখনও যে তার পূজা, তার মূলে হ'ল 'অধ্যাস'। একের গুণ আর একজনে দেখা, রামের পাওনা শ্যামকে বুঝিয়ে দেওয়া। অবিশ্যি এ দুয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু একান্ত 'অবিষয়' হ'লে ত 'অধ্যাসেরও' উৎপত্তি হয় না।

আশ্বিন, ১৩২৫

আর্য্যামি

(১)

আমাদের আদিম আর্য্য প্রপিতামহেরা ধরাপৃষ্ঠের ঠিক কোন্ জায়গা থেকে যাত্রারম্ভ করে' যে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছেন, সে প্রশ্নের একটা নিশ্চিত জবাব দেওয়া শক্ত। তাঁরা কি মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম দিকটায় ভেড়া চরাতেন, না নরওয়ের উত্তর-মাথায় মাছ শীকার করতেন, এ তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নি। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে যে যব তাঁরা সকলে মিলে নিঃসন্দেহই খেতেন, তা তাঁদের চাষ করে'-পাওয়া, না ইউফ্রেটিসের তীরের বুনো যব, সে বিষয়েও মহা মতভেদ রয়েছে। তার পর তাঁদের সবারই মাথার প্রস্থের একশ গুণকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ কর্‌লে ভাগফল যে কখনই পঁচাত্তরেব বেশী হ'ত না, এ কথা আর এখন কোনও পণ্ডিতই হলপ নিয়ে বলতে রাজী নন। বরং শোনা যাচ্ছে যে, যেমন আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণেরা সবাই এক আর্য্যবংশাবতংস হ'লেও তাঁদের চেহারায় এ মিলটা ধরার জো নেই, কেননা কেউ কটা কেউ কৃষ্ণ, কারও মাথা গোল কারও চেপ্টা, তেমনি আদিম আর্য্যদের মধ্যেও চেহারার এই গরমিলের দিকেই প্রমাণের পাল্লাটা নাকি বেশী ভারী হ'য়ে

দাঁড়াচ্ছে। এমন কি একদল কালাপাহাড়ি পণ্ডিত এরই মধ্যে বল্‌তে সুরু করেছেন যে, আর্য্য বলে' কোনও একটা বিশিষ্ট জাত, অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট জাত যাকে ঐ এক নামে ডাকার কোনও বস্তুগত কারণ আছে, কোনও দিনই কোনও-খানে ছিল না। ওটা একটা ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের মানসিক সৃষ্টি, 'ওয়ার্কিং হাইপথিসিস্'।

যেমন গতিক দেখা যাচ্ছে, তাতে করে' প্রাচীন ও আদিম আর্য্যজাতির অদৃষ্টে কি আছে বলা কঠিন। আসছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁরা বিধাতার সৃষ্টি বলে' কায়েম হ'য়েও বস্‌তে পারেন, আবার মানুষের কল্পনা বলে' বাস্তব পদার্থের লিষ্টি থেকে তাঁদের নামও কাটা যেতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি। আর্য্যজাতির কপালে যা-ই ঘটুক, তাঁরা বস্তু হ'য়ে চেপেই বসুন, আর অবস্তু হ'য়ে উড়েই যান, 'আর্য্যামি' বস্তুটির তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। যারা মনে করে, কারণ না থাকলেই আর তার কার্য্য থাকে না, তারা না পড়েছে দর্শনশাস্ত্র, না আছে তাদের লৌকিক জ্ঞান। 'নিমিত্ত' কারণ যে একটা কারণ, একথা আরিষ্টটল্ থেকে অন্নভট্ট পর্য্যন্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এবং ও-কারণটি নিজে ধ্বংস হ'লেও তার কার্য্য ধ্বংস হয় না। যেমন নিজের বোনা কাপড়খানির পূর্ব্বেই তাঁতি বেচারীর জীবনান্ত ঘটতে কিছুই আটক নেই। আর পুঁথি ছেড়ে সংসারের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেও এর ভূরি ভূরি প্রমাণ চোখে

পড়্‌বে। যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু 'পাব্‌লিসিটি বোর্ড' চল্‌ছে; জর্ম্মাণভীতি ঘুচে গেল অথচ 'রিফর্ম্ম স্কীম' নিয়ে আমাদের তর্ক শেষ হয় নি; এমন কি বিলাতের কলের মজুরেরা যেমন যুদ্ধের মধ্যে দুবেলা পেটপুরে খেয়েছে, যুদ্ধের পরেও তেমনি চলুক বলে' হাঙ্গাম উপস্থিত করেছে।

কিন্তু প্রকৃত গোড়ার কথা এই যে, 'আর্য্যামির' সঙ্গে 'আর্য্যের' আসলে কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। আর্য্যজাতি পৃথিবীতে যতই প্রাচীন হ'ন না কেন, 'আর্য্যামি' জিনিষটি যে মনুষ্য-সমাজে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাচীন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। ব্যুৎপত্তি দিয়ে বস্তুনির্ণয়ের চেষ্টা করে শুধু এক বৈয়াকরণ; এবং ও-জাতটি যে কাণ্ডজ্ঞানহীন একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। 'আর্য্যামি' হ'ল মানুষের সেই মনোবৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ, বিলাতী পণ্ডিতদের মতে যাতে ইতর প্রাণী থেকে মানুষ তফাত, অর্থাৎ তার 'সেল্‌ফ্‌ কন্‌শাস্‌নেস্‌'; আর দেশীতত্ত্বজ্ঞদের মতে যার সম্পূর্ণ বিনাশ, অথবা যা একই কথা— চরম বিকাশই হচ্ছে পরামুক্তির পথ, অর্থাৎ অহংজ্ঞান। সমাজতত্ত্ববেত্তারা বলেন, মানুষ যে পরের মধ্যে নিজের সাদৃশ্য দেখে, তাতেই সে অপরের সঙ্গে সমাজ বেঁধে ঘর কর্‌তে পারে। এই সাদৃশ্যবোধ হ'ল সমাজবন্ধনের একটা পোক্ত শিকল। কিন্তু সবাই জানে ভিন্ন জিনিষের মধ্যে সাদৃশ্যজ্ঞানটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। সূক্ষ্মবুদ্ধির কাজ হচ্ছে একই রকম জিনিষের মধ্য থেকে তফাত বের করা। সুতরাং মানুষ যখন সূক্ষ্মবুদ্ধির

জোরেই করে' খাচ্ছে, তখন তার বুদ্ধির স্বাভাবিক ঝোঁকটা হ'ল পরের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য নিয়ে খুসি না থেকে, এই মিলের মধ্যে অমিল কোন্ কোন্ জায়গায় তাই খুঁজে বের করার দিকে। আর এ খোঁজে কাকেও ব্যর্থ হ'তে হয় না। কেননা একে ত লাইব্‌নিজ প্রমাণই করে' গেছেন যে, সংসারে দু'টি বস্তুর ঠিক এক রকম হবার কোনও জো-ই নেই; আর লাইব্‌নিজ ছিলেন একজন দিগ্‌গজ গণিতজ্ঞ লোক। তার পর সবাই নিজকে জানে সাক্ষাৎভাবে, অন্য সকলকে পরোক্ষে। আমার বুদ্ধি আমার কাছে স্বপ্রকাশ, অন্যের বুদ্ধি আছে কি নেই, সেটা অনুমানের কথা। কাজেই আমি যে অন্য সকলের চেয়েই ভিন্ন রকমের, এবং মোটের উপর এ রকমটি আর হয় না, এ জ্ঞান যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। নিজের সম্বন্ধে এই মর্ম্মগত বোধটা লোকে যখন প্রকাশ করে' ফেলে, তখন তার নাম হয় 'অহঙ্কার', দ্বিতীয় ভাগ থেকে বেদান্তগ্রন্থ পর্য্যন্ত সবাই যার একটানা নিন্দা করেন। আর এ ভাবটি যখন একটা দলকে ধরে' প্রকাশ হয়, তখন সেই বস্তুটিই হ'ল 'আর্য্যামি'। কেবল দলের প্রকারভেদে নামের রকমভেদ ঘটে, যেমন আভিজাত্য, ব্রাহ্মণত্ব, পেট্রিয়টিজ্‌ম্, অ্যাংলো-স্যাক্‌সনত্ব ইত্যাদি। এবং ভাট, চারণ, কবি, ঐতিহাসিক সকলে মিলে মানুষের সভ্যতার সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত এর জয়গান গেয়ে আস্‌ছে।

সংসারে এমন সব সরলবুদ্ধির লোকও আছে যারা প্রশ্ন করে' বসে ব্যক্তির পক্ষে যেটা দোষের, সমাজ বা জাতি, অর্থাৎ

ব্যক্তিসমষ্টির পক্ষে সেইটিরই বর্দ্ধিত সংস্করণ বা 'এন্‌লার্জড্ এডিশন্' কেন প্রশংসার?—অবশ্য এর সোজা উত্তর এই যে, ব্যক্তি আর জাতি এক নয়, কেননা যদি তা হ'ত, তা হ'লে ও-দুয়ের নাম এক না হ'য়ে, ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন! উক্তরূপ প্রশ্নকর্ত্তাদের পাণ্ডিত্যের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা নেই; না হ'লে জর্ম্মাণ, অ-জর্ম্মাণ সব রকম পণ্ডিতের প্রাচীন নতুন নানা মত তুলে এ-ও দেখান যেত যে, জাতি বা 'ষ্টেট্' জিনিষটা মোটেই ব্যক্তির সমষ্টি নয়। কেননা ও-নিজেই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যার একটা নিজস্ব গুণ, ইচ্ছা, অনুভূতি আছে, যা জাতি বা ষ্টেটের লোকদের গুণ, ইচ্ছা ও অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র, মোটেই তার সমষ্টি নয়। অর্থাৎ দেশের সব লোক দরিদ্র হ'লেও দেশটা ধনী হ'তে কোন আটক নেই। আর এ কথা যে ঠিক, ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোককেই তা স্বীকার কর্‌তে হবে। এই সব সূক্ষ্ম অথচ প্রকাণ্ড তত্ত্ব যাদের বুদ্ধির অগম্য তাদের জন্য একটা সহজ ছোট উত্তর দেওয়া যাচ্ছে। কারু নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করাটা যে, সমাজে নিন্দার কথা, তার কারণ ঐ এক অহং-এর খোঁচা আর সকল অহং-এর গায়ে লেগে তাদের ব্যথিত করে' তোলে। কিন্তু একটা গোটা দলকে ধরে' যখন এটি প্রকাশ হয়, তখন দোষটা আর থাকে না। এবং এতে দলের সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যায়। অবশ্য এক দলের অহং-বোধটা অন্য আর এক দলের গায়ে লাগেই লাগে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা আমাদের

যা কিছু রীতি, নীতি, বিধি, নিষেধ, সে সবই হ'ল ছোট হোক বড় হোক কোনও একটা দলের লোকদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারকে লক্ষ্য করে'। এক দলের সঙ্গে আর এক দলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা এ সব কোনও কিছুরই লক্ষ্য নয়! সেই জন্য লোকের সঙ্গে কথায় ও কাজে যে লোকের ভদ্রতার সীমা নেই, সেই লোকই একটা সমস্ত জাতির সম্বন্ধে কথায় বা ব্যবহারে কোনও রকম ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। যে লোক জীবনে কাকেও কোনও দিন কড়া কথা বলে নি, সেও দল বেঁধে একটা গোটা দেশকে পেষণে ও শোষণে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

আধুনিক য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে "ইণ্টারন্যাশান্যাল্ ল" বলে' যে আপোষি ব্যবহারনীতির চলতি আছে, সকলেই জানে যে, তার গোড়ার কথা হচ্ছে সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের যে সব নিয়ম কানুন গড়ে' উঠেছে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ব্যবহারে সেই গুলিকে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ডাচ্ পণ্ডিত হ্যুগো গ্রোসিয়াস্‌কে এই আন্তর্জাতিক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলা চলে। এ সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র আলোচনা করেছেন তিনিই জানেন যে, রোমান ব্যবহার-শাস্ত্রে লোক-ব্যবহারের যে নিয়মগুলি সর্ব্বসাধারণ, সুতরাং স্বাভাবিক বলে' গণ্য হয়েছিল, গ্রোসিয়াস সেই গুলিকেই তাঁর মৈত্রীবিগ্রহ সংহিতার ভিত্তি করেছিলেন। ব্যক্তির নীতিকে সমষ্টির রীতি করে' তোলার এই চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে, ১৯১৪ সালে

তার একটা পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, এবং ১৯১৮ সালেই তার শেষ হয়েছে এমন মনে কর্‌বার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

একটা অবান্তর কথা দিয়ে 'আর্য্যামির' এই উৎপত্তি পর্ব্বের অধ্যায় শেষ করা যাক্। ইংরেজ-দার্শনিক হব্‌স্ গ্রোসিয়াসেরই সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, আদিতে মনুষ্য-সমাজ রাষ্ট্রবদ্ধ ছিল না। এবং কাজেই পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মও চল্‌তি ছিল না। সে ছিল একটা নিত্য বিগ্রহ বিবাদের যুগ, যখন প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু, এবং সবারই হাত তখন সবারই বিরুদ্ধে তোলা থাকৃত। এই ভয়ানক দুরবস্থাটা মোচন কর্‌বার জন্যই সবাই মিলে একটা "ষ্টেট্" গড়ে' তার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে, এবং "ষ্টেট্" পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের আইন-কানুন বেঁধে দিয়ে বৈষম্যের জায়গায় শান্তি এনেছে। বহু পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন এবং এখনও করছেন যে, হব্‌সের এই কল্পনাটা একেবারে অনৈতিহাসিক। মানুষ কোনও দিনই সমাজ ছাড়া ছিল না, এবং কোনও রাষ্ট্র-গড়ার মজলিসের প্রসিডিং, কি পাথরে কি তামায়, এ পর্য্যন্ত কোনও পুরাতত্ত্ববিদই আবিষ্কার কর্‌তে পারেন নি। কিন্তু একটা সন্দেহ মনে না এসে যায় না। মানুষের আদিম অবস্থার এই যে কল্পনাটা সেটা হব্‌স্ নিয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ থেকে। অর্থাৎ গ্রোসিয়াস চেয়েছিলেন, লোক-ব্যবহারের নীতি দিয়ে এই সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে, আর

হবস্ কল্পনা করেছিলেন, এই নীতি নিয়ম প্রচলনের পূর্ব্বে লোকের সঙ্গে লোকের সম্বন্ধ ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধেরই মত। পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে গ্রোসিয়াসের বিখ্যাত পুঁথির ছাব্বিশ বছর পরে হবসের 'লিভিয়াথন' প্রকাশিত হয়।

(২)

আর্য্যামির জন্মরহস্যটা একবার প্রকাশ হ'লে তার জীবন-চরিতের হেরফেরগুলো বুঝ্তে আর কষ্ট হয় না।

বড় হোক, ছোট হোক একটা দলের নাম দিয়ে নাকি এ জিনিষটিকে চালাতে হয়, তাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে অল্প-বিস্তর মোটা রকম বাহ্যিক লক্ষণের উপরেই দাঁড় করান ছাড়া উপায় থাকে না। গায়ের চামড়ার রং, মাথার খুলির মাপ, সাগরবিশেষের পশ্চিম পারে কি পর্ব্বতবিশেষের উত্তর ধারে নিবাস স্থান, খাবার জিনিষে নাইট্রোজেনের প্রাচুর্য্য কি স্নেহ-পদার্থের আধিক্য, পূর্ব্বপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে' বর্শা চালাতেন কি মাটীতে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়্তেন, এই রকম যা হোক কিছু একটার উপরেই একটা প্রকাণ্ড অভিমানের ইমারত গড়ে' তুল্তে হয়। অবশ্য এই চর্ম্মাস্থি-বিদ্যা, ভৌগলিক-তথ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার এর প্রত্যেকটিরই 'ইন্নুয়েণ্ডো' বা ইঙ্গিত হচ্ছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর এক একটি লম্বা ফর্দ্দ। এ সব লক্ষণের সঙ্গে এ সব গুণের কোনও রকম "অন্যথা সিদ্ধিশূন্য" বা নিত্যসম্বন্ধ আছে কিনা সে

সন্দেহে আর্য্যামির অভিমানকে কখনও সঙ্কুচিত হ'তে হয় না। কেননা লক্ষণগুলি হ'ল বাহ্যিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, আর গুণগুলি হ'ল নিগূঢ় অর্থাৎ আনুমানিক। প্রত্যক্ষ নিয়ে তর্ক চলে না, আর তর্কের ভূমিই হ'ল অনুমান। এবং তর্ক জিনিষটার সুবিধা এই যে, এ ব্যাপারে পরাজয় নির্ভর করে বিপক্ষের শক্তির উপর নয়, নিজের ইচ্ছার উপরে। নিজে স্বীকার না কর্‌লে তর্কে হার হয়েছে, এ অবশ্য কেউ প্রমাণ কর্‌তে পার্‌বে না। কেননা সেইটিই হবে আবার একটা তর্কের বিষয়।

ব্যক্তির অহঙ্কারের চেয়ে সমষ্টির অহঙ্কারের একটা শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, একা একা যা নিয়ে কোনও রকমেই অহঙ্কার করা চলে না, দল বেঁধে তাকেই একটা দুর্জ্জয় অহঙ্কারের কারণ করে' তোলা যায়। এক যুগের ফরাসীরা সে যুগের ইংরেজদের বুদ্ধি-সুদ্ধিতে বিশেষ মুগ্ধ না হ'য়ে, তাদের নাম দিয়েছিল 'জন বুল'। আজ ইংলণ্ডের খবরের কাগজ লেখকেরা এই নামটাকেই একটা উৎকট জাতীয় অভিমান প্রকাশের রাস্তা করে' তুলেছে। এ জাতির বুদ্ধি যে একটু মোটা বলে' বোধ হয়, তার কারণ এ বুদ্ধি হাল্‌কা নয়, গুরুতর রকমের ভারী; এতে যে বেশী ঢেউ খেলে না, এর অতলস্পর্শ গভীরতাই হ'ল তার কারণ; এ জাত যে চট্‌ করে' একটা 'থিওরী' কি 'আইডিয়েল' নিয়ে মেতে ওঠে না তার কারণ এদের স্থির 'প্র্যাকৃটিক্যাল' বুদ্ধি; ফরাসীর মত এদের সাম্য ও স্বাধীনতা এক দিনে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, কারণ নজীরের পর নজীর ধরে'

ক্রমশঃ এর আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে, সেইজন্য গতিটা একটু মন্থর। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, 'জনবুলত্বের' এত গুণব্যাখ্যান সত্ত্বেও কোনও ইংরেজ এটা স্বীকার করতে রাজী হবে কিনা, তার নিজের বুদ্ধিটা আপাতদৃষ্টিতেও একটু মোটা, যতই গুরুত্ব এবং গভীরতা সে দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ হোক না কেন। অর্থাৎ 'জনবুলত্বের' উপর জাতীয় অভিমান অনায়াসে দাঁড় করান যায়, কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষে ওটাকে নিয়ে অহঙ্কার দেখান একটু শক্ত। বোধ হয় ঠিক এই কারণেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতাগুলিকে লজ্জা দিয়ে বিদায় কর্‌বার জন্য প্রবন্ধে, গানে, বক্তৃতায় যে সব চেষ্টা হয়েছে, তাতে তেমন আশানুরূপ ফল দেখা যায় নাই। কেননা লজ্জা জিনিষটা মানুষে পায় কোনও কারণে দল থেকে তফাৎ হ'য়ে পড়্‌তে হ'লে। সুতরাং সবাই মিলে দল বেঁধে লজ্জা পাওয়াটা বড় একটা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না। বরং জাতীয়-জীবনের অবস্থা দেখে সবাই মিলে যে লজ্জা পাওয়ার চেষ্টা কর্‌ছি এই ব্যাপারটিকেই একটা অহঙ্কারের কারণ করে' তোলা কিছুই কঠিন নয়।

(৩)

'আর্য্যামি' যত রকমের আছে, বলা বাহুল্য, তার মধ্যে সেরা হচ্ছে জন্মগত 'আর্য্যামি'। এর কারণও খুব স্পষ্ট। জন্মকে ভিত করে' 'আর্য্যামির' অহঙ্কার দাঁড় করানো যেমন সহজ, এর শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্দ্ধাটাও হয় তেমনি গগনস্পর্শী। জন্মের উপর

যে জীবের গুণাগুণ নির্ভর করে তা ঘোড়ার বংশে যখন ঘোড়া আর গরুর বংশে গরুই জন্মাচ্ছে তখন অস্বীকার কর্‌বার জো নেই। আর ভেদটা কেবল পৃথক জাতীয় ভেদ নয়, স্বজাতীয় ভেদও বটে সে কথা নবীন লেখক হাউষ্টন চেম্বারলেইন ও প্রাচীন ঋষি বশিষ্ঠ (১) দু'জনেই তেজী ঘোড়ার উঁচু বংশের দৃষ্টান্তে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জন্মের উপর শ্রেষ্ঠতার দাবীকে ভিত্তিহীন বলে' সরাসরি অগ্রাহ্য করা চলে না, এবং এ দাবী উপস্থিত কর্‌তেও এক জন্মান ছাড়া আর কিছুই অপরিহার্য্য নয়। কোনও বিশেষ বংশের সঙ্গে বিশেষ গুণের যোগাযোগ আছে কিনা সে তর্ক তোলা যায় বটে, কিন্তু এর মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা না থাকাতে কারও কোনও ভয়ের কারণ নেই। বর্ত্তমান বংশধরদের মধ্যে গুণটা না থাক্‌লেই যে সে গুণ বংশে নেই এটা একেবারেই প্রমাণ হয় না। কেননা বর্ত্তমানে হয়ত ওটা 'লেটেণ্ট' ভাবে রয়েছে, ভবিষ্যবংশীয়দের মধ্যে ঠিক ফুটে বেরুবে! 'অ্যাটেভিজ্‌ম্' যে একটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ত ডার্‌উইনের পুঁথিতেই রয়েছে! 'জার্‌ম্ প্ল্যাস্‌ম্' জিনিষটি যে অমর, সে তথ্য বাইস-ম্যানই প্রমাণ করে' গেছেন।

আর এই সহজ দাবীটির বহরই বা কি বিরাট। এ যে শ্রেষ্ঠত্ব, এ মিশে রয়েছে একেবারে রক্তের সঙ্গে, তৈজস-নাড়ীর

(১) "কুলাপদেশেন হয়োঽপি পূজ্য—
তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি॥" (বশিষ্ঠ-সংহিতা।)

অণুতে অণুতে। যার সঙ্গে সে রক্তের সম্পর্ক নেই, সে সারা জীবন তপস্যাতেও এর কাছে ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না। অথচ এই দুর্লভ মহত্ত্ব যারা পেয়েছে তারা পেয়েছে একবারে বিনা আয়াসে; মিতাক্ষরা বংশের ছেলের মত কেবলমাত্র জন্মের জোরে ও জন্মের সঙ্গে। একে লাভ কর্‌তেও যেমন আয়াস নেই, বজায় রাখ্‌তেও তেমনি কষ্ট নেই। কেননা এ শ্রেষ্ঠত্বকে ঝেড়েও ফেলা যায় না, এর নষ্ট হবারও ভয় নেই। সহজ কথায় জন্মগত আর্য্যামিটি হচ্ছে দল বেঁধে প্রতিভা ও আরও কিছু উপরির দাবী। কেননা প্রতিভারও উত্তরাধিকার নেই।

এ কথা বোধ হয় আর না বল্‌লেও চলে যে, মিত্তির বংশের গৌরব ও নয়নজোড়ের বাবুয়ানা থেকে আরম্ভ করে' কুলীনত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, দ্বিজত্ব, শ্বেতচর্ম্মত্ব এবং অবশেষে আর্য্যত্ব পর্য্যন্ত সবই হ'ল জন্মগত আর্য্যামিরই প্রকারভেদ। এর প্রতিটিই একটা না একটা আস্ত দলের পক্ষে অসাধারণত্বের দাবী। অবশ্য কোন দল ছোট, কোনটি মাঝারি, কোনটি অতি প্রকাণ্ড। কিন্তু সর্ব্বত্রই দলের লোকদের পরস্পর সম্বন্ধ হচ্ছে সপিণ্ড সম্বন্ধ, হয় বস্তুগত্যা, নয় কল্পিত। তবে এ সপিণ্ডত্বের সাত পুরুষে নিবৃত্তি হয় না। দরকার হ'লে একে ব্রহ্মার মুখ পর্য্যন্ত, কি আদি আর্য্যভূমির আদিম আর্য্য-দম্পতি পর্য্যন্ত অনায়াসে টেনে নেওয়া চলে। এবং যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বোধ হয় এর একটাকে আর একটার চেয়ে বড় বেশী অপ্রামাণ্য বলতে সাহসী হবেন না।

(৪)

জন্মগত আর্য্যামি এ পর্য্যন্ত যত রকমের দল ধরে' প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় দল হ'ল আর্য্যত্বের দল। আর্য্যামি ও আর্য্যত্ব দুটি যে এক জিনিষ নয়, দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই প্রকারবিশেষ মাত্র, এতক্ষণের আলোচনায় এ কথাটি নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে; সুতরাং এর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই 'আর্য্যামি'বিশেষের দু'-একটি বিশেষত্বের আলোচনা না কর্‌লেই নয়। কেননা 'আর্য্যামি'র এই বিরাট প্রকাশটিকে একবার ধারণা কর্‌তে পার্‌লেই আর্য্যামির স্বরূপ বুঝ্‌তে আর কিছু বাকী থাকবে না।

এই আর্য্যামির ছোটখাট দাবীটি কতকটা এই রকমের:— পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে যত সব জাতির আবির্ভাব হয়েছে, আর্য্যজাতি যে তাদের মধ্যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা নয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব একবারে অতুলনীয়। আর্য্যেতর কোনও জাতির সঙ্গে শরীরে কি মনে তার কোনও তুলনাই চলে না। আদিকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতার যা কিছু সৃষ্টি তা সবই হয়েছে আর্য্যজাতির কোনও না কোনও শাখার হাত দিয়ে। অন্য সব জাতির সামান্য যা দান, তা সফল ও সার্থক হয়েছে, কেবল আর্য্য-মহারাজ তা গ্রহণ করে' নিজস্ব করেছেন বলে'। এ জাতির যা আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজ তাই হ'ল সদাচার, সদ্ধর্ম্ম, শিষ্ট সমাজ, আর এর বাইরে সবই 'অনার্য্য' ও 'বার্ব্বারিক'। সুতরাং "পৃথিবীর আধিপত্যে আর্য্যজাতির যে দাবী

সে খাঁটি ন্যায়ের দাবী। গ্রীক-আর্য্য অ্যারিষ্টট্‌ল্‌ বলেছেন যে হঠাৎ যদি পৃথিবীতে একদল লোকের আবির্ভাব হয়, যারা কেবল শরীরের আয়তনে ও গড়নে দেবতাদের মত আর সব মানুষের চেয়ে তফাৎ ও শ্রেষ্ঠ তবে সবাই নির্ব্বিবাদে স্বীকার কর্‌বে যে, আর সমস্ত লোকের উপর তাদের আধিপত্যের ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। এবং যদি কেবল সামান্য দেহের সম্বন্ধেই এ কথা ঠিক হয়, তবে মনে যারা অসাধারণ সাধারণ লোকের উপর তাদের আধিপত্যের অধিকারটা কত বেশি! এই কথাটাই খুব অল্পের মধ্যে প্রকাশ করে' তিনি বলেছেন যে, 'এক জাতির লোক স্বভাবতঃই স্বাধীন, আর এক জাতি লোকের স্বভাবই দাসত্ব।' এই হচ্ছে সার সত্য। কেননা স্বাধীনতা জিনিষটা মনুষ্যত্বের সামান্য ধর্ম্ম নয় যে সব মানুষেরই তাতে কোনও অধিকার আছে; কারণ এ ত খুব স্পষ্ট যে, সে অধিকার নির্ভর করে স্বাধীনতার মূল্যোপলব্ধির ক্ষমতার উপর, যার ভিত্তি হ'ল দেহের ও মনের শক্তি। এ কথা খুব নির্ভয়েই বলা চলে যে, অনেক জাতির লোক রয়েছে স্বাধীনতার কল্পনাও যাদের অজ্ঞাত। সেইজন্য দাসত্ব কি প্রভুত্ব দুই অবস্থাই তাদের সমান। যতটুকু উন্নতি তাদের সম্ভব, অবস্থাভেদে তার কোনও প্রভেদ ঘটে না। ঈহুদি, চীনা, সেমিটিক ও অর্দ্ধসেমিটিক জাতিগুলি এর দৃষ্টান্ত।"

উপরের বর্ণনায় আর্য্যজাতির আধিপত্য-দাবীর অংশটা, অর্থাৎ এ ন্যায়ের প্রতিজ্ঞাটি, প্রসিদ্ধ লেখক হাউষ্টন চেম্বার-

লেইনের 'উনবিংশ শতাব্দীর ভিত্তি' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে' দিয়েছি। চেম্বারলেইন জাতিতে ইংরেজ, শিক্ষায় জার্ম্মান; এবং তাঁর পুঁথি রচনা করেছেন জার্ম্মানভাষায়। যাঁরা চেম্বারলেইন-এর মতামতের খুব সদয় সমালোচক নন তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর হাতের কলম হ'ল সোনার কাঠি। বস্তুত সে কলম যে সলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার বিচিত্র ইতিহাসের উপর দিয়ে চলে' গিয়েছে, তাতে মুগ্ধ না হ'য়ে উপায় নেই। তাঁর গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা থেকে যে রসজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ, শ্রদ্ধা ও ঘৃণা, অনুরাগ ও বিদ্বেষের তীব্র আলো ঠিক্‌রে পড়্‌ছে তাতে অল্প-বিস্তর চোখ না-ঝল্‌সে যায় না। কিন্তু আর্য্যজাতির পক্ষে এই যে সর্ব্বাধিপত্যের দাবী, যা তাঁর পুঁথিতে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বারবার উপস্থিত করা হয়েছে, এর কদর্য্যতা ও ভীষণতা চেম্বারলেইন-এর কলমের কালিতেও একটুকও ঢাকা পড়ে নি।

কেননা এর পাণ্ডিত্যের পোষাক আর যুক্তির মুখোস খুলে ফেল্‌লে যা বেরিয়ে পড়ে, সে হচ্ছে আদিম নগ্ন বর্ব্বরতা, যা নিজের দলের বাইরে কাকেও শত্রু ছাড়া আর কিছু মনে কর্‌তে পারে না। এবং হয় মৃত্যু নয় দাসত্ব এ ছাড়া সে শত্রুতার আর কোনও অবসানও কল্পনা কর্‌তে পারে না। হয় ত মানুষের ইতিহাসে এমন একদিন ছিল যখন সমস্ত জাতি মানুষের দল, কি আর্য্য কি অনার্য্য, এই মনোভাব নিয়েই প্রতিবেশী অন্য

সব দলের সঙ্গে কারবার কর্‌ত। এবং এও সম্ভব যে এই নির্ম্মম বিরোধের উষ্ণ রক্তের স্পর্শেই মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে; তার সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যবহারে প্রাণ ও গতিসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মানুষের এই যে আদিম ভয় ও বিদ্বেষ, লোভ ও নিষ্ঠুরতা, এ হ'ল প্রকৃতির অদম্য ও অন্ধ শক্তিরই রূপান্তর। এ তর্ক করে না, যুক্তি দেয় না, ন্যায়ের দোহাই পাড়ে না, সুন্দরবনের বাঘের মত শিকার দেখ্‌লেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। দামোদরের বন্যার ধ্বংসলীলার মত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রমাণে এরও কোনও বিচার চলে না। কিন্তু যখনি তর্ক করে', যুক্তি দিয়ে, ন্যায়-ধর্ম্মের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে' জাতির উপর জাতির আধিপত্যকে, দলের সঙ্গে দলের শত্রুতাকে খাড়া রাখ্‌তে হয় তখনি বুঝ্‌তে হবে যে, সে জাতি প্রকৃতির গোড়ার ধাপ ছাড়িয়ে উঠেছে। কারণ সে জাতির কাছে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়েছে যে জাতির সঙ্গে জাতির, দলের সঙ্গে দলের এক শত্রুতার সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ সম্ভব, এবং সেই সম্বন্ধই নিত্য ও ঘনিষ্ঠ। এ ধাপে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ধর্ম্মকেই ধর্ম্মের বিচারে আশ্রয় কর্‌লে ধর্ম্মও এখন তাকে বিচার কর্‌বে। প্রস্তাবনা ও প্রথম অঙ্ককে সমস্ত নাটকের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টান্‌তে চেষ্টা কর্‌লে কাব্যের সৌন্দর্য্য তাতে কেবল আঘাতই পাবে।

মানুষের সভ্যতায় আর্য্যজাতির দান অনেক, হয়ত অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। কিন্তু মানুষের উপর তার আর্য্যামির আঘাতও কম প্রচণ্ড নয়। আর্য্য-রোম অনার্য্য-কার্থেজকে একবারে ধূলা না

করে' তৃপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ অন্য একটা সভ্যতাকে একবারে ধ্বংস না করে' নিজের সভ্যতাকে বজায় রাখ্‌বার কোনও পথ সে খুঁজে পায় নি। যে হিন্দু আর্য্য ওষধি ও বনস্পতিতে বিশ্ব-প্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করেছে, 'দস্যু' ও 'রাক্ষসের' প্রাণের উপর সেও কোনও মায়া দেখায়নি। আধুনিক য়ুরোপীয় আর্য্য দুটি মহাদেশ থেকে সেখানকার অনার্য্য অধিবাসীদের একেবারে মুছে ফেলেছে, এবং আর একটা মহাদেশ থেকেও মুছে ফেল্‌বার চেষ্টায় আছে। এ চেষ্টার সমর্থনে যুক্তির অবশ্য অভাব নেই। এই উচ্ছেদ ও ধ্বংস না হ'লে যে আধুনিক আর্য্য-সভ্যতার যে গৌরব, তারও বিকাশই হ'তে পার্‌ত না। এই গরীয়সী সভ্যতাকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়াই হ'ল ধর্ম্ম। এবং যাদের রক্তের মধ্যে এই সভ্যতা রয়েছে তাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া এর অন্য কোনও উপায় নেই। তাতে যদি অন্য সব জাতিকে পৃথিবী ছেড়ে গিয়েও এর যায়গা করে' দিতে হয় মানবজাতির পক্ষে সেও মঙ্গল। লক্ষ্মণের কাছে অগস্ত্য-ঋষির পরিচয় দিতে রামচন্দ্র তাঁকে 'পুণ্যকর্ম্মা' বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা তাঁর ত্রাসে দক্ষিণদিকে "রাক্ষসেরা" পা বাড়াতে সাহস না করায় সে দিকটা "লোকদের" বাসের উপযুক্ত হয়েছে। এবং এ যুক্তির উত্তর দেওয়াও কঠিন। কেননা যা: ঘটেছে তার বিরুদ্ধে যা ঘটেনি তাকে ওজনে তোলা চলে না। বর্ত্তমান আর্য্য-সভ্যতা না গড়ে' উঠ্‌লে আর্য্য অনার্য্য মিশাল সভ্যতা কি রকমের হ'ত, কি তেমন কোনও সভ্যতা সৃষ্টি হ'তে

পারৃত কি না এ তর্ক এখন তোলা একবারেই নিষ্ফল, কারণ এর কোনও রকম মীমাংসার সুদূর সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের উপর আধিপত্য ও উচ্ছেদের দাবীটা যে কত অচল, মানুষের সভ্যতার গোটা ইতিহাসটাই তার প্রমাণ। এ দাবীর গোড়ার কল্পনা হ'ল এই যে, যে জাতি একবার বড় হ'য়ে উঠেছে সে চিরকালই বড় থাকৃবে, এবং আর কেউ বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পারৃবে না। অথচ যে সব জাতির পর জাতি এতকাল ধরে' মানুষের সভ্যতাকে কখনও ধীরে কখনও দ্রুত গড়ে' তুলেছে তাদের কেউ কারও বংশধর নয়। আজই কি হঠাৎ মানুষের সভ্যতায় এই ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা থেমে গেল! অথচ চিরকালই ত যে মাথায় উঠেছে সেই মনে করেছে সে একেবারে অচ্যুত। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জাতির পতন হ'লেও তার যে কেন সেটা ঘটৃবে না তার কারণ খুঁজে বের করৃতে কারও কখনও কষ্ট হয়নি। প্রতিদিন জীব যম-মন্দিরে যাচ্ছে দেখেও অমরত্বের কল্পনা আশ্চর্য্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও বেশি আশ্চর্য্য এই কল্পনা যে, যারা বেঁচে আছে তারা যে কেবল অমর হবে তা নয়, আর নতুন কারও জন্মও হবে না।

(৫)

আর্য্যত্বের 'আর্য্যামি' এতক্ষণ যা বর্ণনা করেছি সে হ'ল তার একটা মাত্র দিক। কেননা ব্রহ্মের যেমন দুইরূপ, এ আর্য্যামিরও

তেমনি দুই মূর্ত্তি ; সগুণ ও নির্গুণ, ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয়। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানে এর প্রথমটির বিকাশ হ'য়েছে য়ুরোপের আর্য্য-সমাজে, দ্বিতীয়টির পূর্ণ-প্রকাশ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে। পশ্চিম শাখাটি দাবী করছে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব ; তার ক্রিয়ার দাপটে আর সকলের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া এক রকম রুদ্ধ। আর পূবের শাখাটি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং", "অপ্রাণ" ও "অমন"। সকলেই জানে যে সগুণত্বের সিঁড়ি দিয়েই নির্গুণত্বে পৌঁছিতে হয়। ভারতীয় আর্য্যেরাও অবশ্য তাই করেছেন। ক্রিয়াশীলত্বের সিঁড়ি দিয়ে নিষ্ক্রিয়ত্বের ছাদে এসে পৌঁচেছেন। এটা যে পরমার্থের অবস্থা তাতে সন্দেহ নেই, কেননা 'একরূপে অবস্থিত যে অর্থ' তাই হ'ল পরমার্থ। যাঁরা এ অবস্থা থেকে ভারতের আর্য্য-সমাজকে আবার সচল অবস্থায় নিতে চান তাঁরা 'ইভলিউশনের' গতিবিধির কোনও খবরই রাখেন না।

যা হোক, আর্য্যামির এই সগুণ ও নির্গুণ প্রকাশের মধ্যে একটি আন্তরিক মিল রয়েছে, কেননা এ দুই হ'লেও মূলে এক। সে মিলটি হচ্ছে যে, দুয়ের পথই বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন 'ছুঁৎমার্গ', বাইরের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষা করা। তবে পশ্চিমের ওদের পথ হ'ল আর সবাইকে তাড়ান, আমাদের কৌশল হ'ল সবার কাছ থেকে পালান। শেষ পর্য্যন্ত কোনটায় বেশি ফল হয় বলা কঠিন।

মানুষে মানুষে চরিত্র ও মনের শক্তির যে তফাৎ, জাতির সঙ্গে জাতির সে তফাতের চেষ্টার কোনও অর্থ আছে কি না,

এবং থাকলে সেটা ঠিক কোথায় সে তর্ক না হয় নাই তোলা গেল। মেনে নেওয়া যাক, এ তফাৎ আছে। কিন্তু প্রভেদ-মাত্রই উঁচু নীচুর সম্বন্ধ নয়, এবং বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কাজের পরিমাণও একটা জাতির শক্তিসামর্থ্যের শেষ প্রমাণ নয়। কেননা মানুষের ইতিহাস কিছু শেষ হ'য়ে যায়নি যে, এখনি লাইন টেনে হিসাব নিকাশ আরম্ভ করা যেতে পারে। আজ যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও প্রবল, তারা ট্যাসিটাসের জর্ম্মাণেরই বংশধর। তখন দাঁড়ি টেনেছিলেন বলে' ট্যাসিটাসের ঠিকে যদি ভুল হ'য়ে থাকে, তবে এখন দাঁড়ি টেনে ষ্টুয়ার্ট চেম্বারলেইন-এর ঠিকই বা শুদ্ধ হবার সম্ভাবনা কোথায়! আর শ্রেষ্ঠত্ব, তার অর্থ যাই হোক, যদি প্রভুত্বের নিয়োগপত্র হয়, তবে তার শেষ কোথায়? আর্য্যত্ব এমন কি য়ুরোপীয় আর্য্যত্বের সীমায় এসেই বা তার গতিরোধ হবে কেন? শ্রেষ্ঠের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতমের দাবী কেনই বা না চল্‌বে! কেননা, 'আর্য্যামি' ভেদেরই মন্ত্র, মৈত্রীর বন্ধন নয়। শোনা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরেই ফ্রান্সের নৃ-তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রুশিয়ানরা মোটেই আর্য্য-জাতির লোক নয়, তারা য়ুরোপের প্রস্তর যুগের অধিবাসী-দের একবারে অবিমিশ্র বংশধর। এবং সে যুগের যে সব মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের যে মাথার সব চেয়ে আশ্চর্য্যজনক মিল, সে হচ্ছে প্রিন্স বিস্‌মার্কের মাথা।

মানুষের সভ্যতা যাঁরা গড়ে' তুলেছেন, তাঁরা সবাই অসাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনও বিশেষ বংশ, কুল বা জাতি থেকে তাঁরা

আসেননি। এবং নিজের বংশ, কুল বা জাতির সঙ্গে তাঁদের যে মিল তার চেয়ে অনেক বেশি মিল পরস্পরের সঙ্গে। শুদ্ধোদন যখন শাক্যকুলের সিদ্ধার্থের ভিক্ষুবেশ দেখে ব্যথিত হ'য়েছিলেন তখন ভগবান বুদ্ধ তাকে বলেছিলেন যে, এই তাঁর কুলধর্ম্ম; তাঁর বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা তাঁর পূর্ব্বপুরুষ। প্রকৃতির এই যে ইঙ্গিত, এই হ'ল মানুষের মিলনের সত্য পথের ইঙ্গিত। বংশ, কুল, জাতি কিছুই অসত্য নয়, কিন্তু সে সত্য হ'ল ব্যবহারিক। এরা কাজ চালাবার উপায়, কিন্তু মৈত্রীর সম্বন্ধ কাজের সম্বন্ধ নয়। এই কাজ চালাবার দলকে ধরে' মানুষের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেননা দলের সঙ্গে দলের সম্বন্ধ সব সময়েই থাক্‌বে কাজের সম্বন্ধ, সে 'অ্যালায়েন্স'ই হোক, 'আঁতাত'ই হোক, আর 'লীগ অব নেশন'ই হোক। তাতে শান্তি আস্‌তে পারে কিন্তু মৈত্রী আস্‌বে না। কেননা মৈত্রীর জন্য চাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, দলের সঙ্গে দলের আদান-প্রদান নয়। এবং সে কেবল তখনই সম্ভব, যখন বংশ, জাতি, রাষ্ট্রের প্রাচীর মানুষের চেয়েও উঁচু হ'য়ে উঠে দৃষ্টিকে বাধা না দেয়; যখন নামরূপের মায়া যা এক, তাকে বহু করে' দেখানর কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়।

বৈশ্য

(১)

মনু উপদেশ করেছেন, শূদ্র সমর্থ হ'লেও ধনসঞ্চয় করবে না। কেননা বহুধনের গর্ব্বে সে হয়ত ব্রাহ্মণকেও পীড়া দিতে আরম্ভ করবে। অথচ এই ভৃগুসংহিতা যে-সমাজের ধর্ম্মশাস্ত্র তার ধনসৃষ্টি ও ধনসঞ্চয়ের কাজটি ছিল বৈশ্যের হাতে। এ বর্ণটি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রকারের এমন আশঙ্কা হয়নি, সম্ভব তার কারণ বৈশ্য ছিল আর্য্যসভ্যতার ভিতরের লোক—দ্বিজ। শাস্ত্রের শাসন ছাড়াও তার মনে এই সভ্যতার বাঁধন ছিল, যার টানে কেবল ধনের জোরে বিদ্যা ও বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলার কল্পনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

বিংশ শতাব্দীর বৈশ্যের অবশ্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের বালাই নেই; সভ্যতার বাঁধনকেও সে একরকম কাটিয়ে উঠেছে। কেননা বৈশ্য আজ সভ্যতার মাথায় চড়ে' ব্রাহ্মণকে ডেকে বলছে, তোমার কাজ হ'ল আমার কারখানার কল-কব্জা গড়া, কাঁচামালকে কেমন করে' সস্তায় ও সহজে তৈরীমাল করা যায় তার ফন্দী বাৎলান; না হয় আমার খবরের কাগজে আমার মতলবমত প্রবন্ধ জোগান। শূদ্রকে বলছে, এস বাপু! তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে, লেগে যাও আমার কলের কাজে; পেট-ভাতার অভাব হবে না। আর জেনো এই হচ্ছে সভ্যতা,

এতে অসূয়া করা মানে দেশদ্রোহ, একেবারে সমাজের ভিত ধরে' নাড়া দেওয়া। ক্ষত্রিয়কে বল্‌ছে, হুসিয়ার থেকো যেন এই যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের তৈরী আমার কলের মাল দিকে দিকে ছুটুল, জলে স্থলে এর গতিকে অবাধ রাখ্‌তে হবে, তোমার কামান, বন্দুক, জাহাজ, এরোপ্লেন যেন ঠিক থাকে। বিদেশের বৈশ্য যদি এই বণিকপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে ওঠে, নিজে গুঁড়ো হ'য়ে তাকে গুঁড়ো কর্‌তে হবে। তাতে দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে তোমারও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হবে, আমারও গোলাগুলি, রসদ, হাতিয়ারের কারখানার মুনাফা বেড়ে যাবে। আর ঘরেও তোমার কাজের একেবারে অভাব নেই। আমার কলের মজুরেরা অতিরিক্ত বেয়াড়া হ'য়ে উঠ্‌লে তাদের উপর গুলি চালাতেও মাঝে মাঝে তোমার ডাক পড়্‌বে।

এই যে বৈশ্যপ্রভুর ব্যবস্থা, যার বর্ণ ধর্ম্ম কথনের প্রথম কথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই তিন বর্ণের এক ধর্ম্ম, চতুর্থ বর্ণ বৈশ্যের শুশ্রূষা, এরি নাম 'ক্যাপিটালিজম্‌' বা মহাজন-তন্ত্র। এর নাগপাশ গত একশ' বছর ধরে' ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি অঙ্গে পাকে পাকে নিজেকে জড়িয়ে এসেছে এবং আজ তার চাপে সে সভ্যতার দম বন্ধ হবার উপক্রম। গত যুদ্ধের কামানের শব্দে ট্রেঞ্চের মধ্যে জেগে উঠে ইউরোপের সভ্যতা এ বজ্রবাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার যে ব্যাকুল চেষ্টা কর্‌ছে তারি নাম কোনও দেশে 'সোভিয়েট্‌', কোনও দেশে 'ন্যাশ-ন্যালিজেশন্‌'।

শিক্ষা ও সভ্যতা

(২)

আধুনিক ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থায় যে করে' বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে তার ইতিহাস বিস্ময়কর কিন্তু জটিল নয়। এর মূল ভিত্তি হ'ল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি, প্রকৃতির সকল কাজের শক্তি ও নিয়মের জ্ঞানের অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রসার, এবং সে জ্ঞানকে মানুষের ঘরকন্নার কাজে লাগাবার চেষ্টার অপূর্ব্ব সাফল্য। এর ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার স্থূলদেহ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে নব কলেবর নিয়েছে। সে চেহারা ইউরোপের ও ইউরোপের বাইরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সমস্ত সভ্যতার চেহারা থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের। বাষ্প আর বিদ্যুৎ এই দুই শক্তিকে লোহার বাঁধনে বেঁধে ইউরোপ যে শিল্প, কারু, কৃষি, বার্ত্তা, ব্যবসা, বাণিজ্য গড়ে' তুলেছে তার কাজের ভঙ্গী ও সামর্থ্যের সঙ্গে কোনও যুগের কোনও সভ্যতার সে দিক দিয়ে তুলনা করাই চলে না। যেমন ফরাসী অধ্যাপক সেনোবো লিখেছেন—এ দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে আজকার ইউরোপের যে তফাৎ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের তফাৎ তার চেয়ে অনেক কম। বলা বাহুল্য এ তফাৎ কল কারখানা, রেল ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে মূর্ত্তিমান হ'য়ে রয়েছে। এবং আশা করা যায়, অল্পদিনেই মোটর, এরোপ্লেন সে মূর্ত্তির অদল-বদল ঘটিয়ে এ তফাৎকে আরও বাড়িয়ে তুল্‌বে। কিন্তু এই যে

ইউরোপ কারখানায় কলে শিল্পসামগ্রী তৈরী করছে, রেলে ষ্টীমারে তার পণ্য পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিচ্ছে, টেলিগ্রাফ টেলি-ফোনে দাম দস্তর বেচা কেনা চালাচ্ছে, এর ভিতরের লক্ষ্য কিছুই নূতন নয়। সেটি অতি প্রাচীন, মানুষের সভ্যতার সঙ্গে একবয়সী। সে লক্ষ্য হ'ল—কি করে' মানুষের জীবনধারণের ও সে জীবনের শোভা সম্পদ বিধানের সামগ্রীগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে জোগান দেওয়া যায়। পশুপালন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই এই প্রশ্নেরই উত্তর। কেবল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ তার শিল্প-বাণিজ্যের কৌশলে ও ব্যবস্থায় এ সমস্যার যে সমাধান করেছে, জিনিষের জোগান হিসাবে তা তুলনা রহিত। যা মানুষের অসাধ্য ছিল তা সুসাধ্য হয়েছে; যা বহুদিন, বহুজন ও বহু আয়াসসাধ্য ছিল সামান্য লোকের নামমাত্র পরিশ্রমে তা মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করেছেন, আজ কলের তাঁতে একজনে যে কাপড় বোনে সেটা হাতের তাঁতের ত্রিশজন তাঁতির কাজ; হাতের চরকার এগার শ' জনের সুতো আজ কলের চরকায় একজন কেটে নামাচ্ছে।

কিন্তু এ নব শিল্প-বাণিজ্যের এই যে অদ্ভুত কর্ম্মসামর্থ্য, একে চালনা করতে হ'লে গুটিকতক উপায় অপরিহার্য্য। তার মধ্যে প্রধান হ'ল বিপুল আয়তনের উপাদানকে একই জায়গায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করা এবং তার জন্যে চাই বহু লোককে একত্র জড় করে' তাদের নানা

রকম মজুরীর সাহায্য। আধুনিক কলের দৈত্য, উপকথার দৈত্যর মতই নিমেষে পর্ব্বতপ্রমাণ কাজ করে' ওঠে, কিন্তু সত্যিকার দৈত্য হওয়াতে সে চায় কাজের পরিমাণ মালের জোগান, আর মানুষের হাতের সাহায্য। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের এই নূতন কৌশলকে কাজে লাগাতে হ'লে চাই দেশ বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে' জমা করা, কল গড়ে' কারখানা বসান, আর সে কল-কারখানা চালাবার জন্য নানারকম বহু মজুর একত্র করা। এবং এ-সবারই জন্য চাই টাকা, অর্থাৎ—পূর্ব্বসঞ্চিত ধন। যাতে মাল কেনা চল্‌বে, কল-কারখানা তৈরী হবে, মজুরের মজুরী যোগাবে। এবং সে টাকা অল্পস্বল্প হ'লে চল্‌বে না, একসঙ্গে চাই বহু টাকা। কেননা এ ব্যাপারের মূল কথাই হচ্ছে, যা পূর্ব্বে নানালোকে নানা জায়গাতে অল্পেস্বল্পে এবং অল্পস্বল্প তৈরী কর্‌ত, তাই কর্‌তে হবে এক জায়গায়, এক তত্ত্বাবধানে, বিদ্যুৎগতিতে আর হাজার গুণ বেশি পরিমাণে। ফলে ইউরোপ জুড়ে কল-কারখানা তারাই বসিয়েছে হাতে যাদের ছিল জমান-টাকা এবং কলের চাকার পাকে পাকে নামতার আর্য্যার মত সে টাকা বেড়ে উঠেছে। আর টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলও বেড়েছে কারখানাও বড় হয়েছে। অর্থাৎ—টাকার অঙ্কটা আরও বেড়ে চলেছে। আর এও অতি স্পষ্ট যে এই কলের তৈরী মালের রাশিকে দেশবিদেশে কাটাতে হ'লে চাই বড় মূলধনী ব্যবসায়ী, যারা একদমে একে নিঃশেষ করে' কিনে নিতে পার্‌বে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর হাত দিয়ে ধীরে সুস্থে এ মাল

কাটানোর চেষ্টা করা এসব কারখানার মালিকদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। এমনি করে আজকার ইউরোপের যে বিরাট্ ধনসম্পদ্ তার একটা প্রকাণ্ড অংশ এসে জমেছে সংখ্যায় অতি অল্প একটি শ্রেণীবিশেষের হাতে—যারা কারখানার মালিক বা সেই কারখানার মালের ব্যবসায়ী। হিসাবে দেখা গেছে যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (যা ইউরোপের একখণ্ড 'ছিট' মাত্র) দেশের সমুদয় ধনের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি রয়েছে লোক সংখ্যার ত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগের হাতে। ধনের গৌরব সব দেশে, সব কালেই ছিল ও থাকৃবে। স্থতরাং এই অতি-ধনী বৈশ্য শ্রেণীটি যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তিশালী হবে এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই।

(৩)

কিন্তু এই মহাজন সম্প্রদায়টির ইউরোপে যা প্রভাব ও প্রতিপত্তি ধন গৌরবের উপর তার সামান্য অংশই নির্ভর করৃছে। যার টাকা নেই সে যার টাকা আছে তাকে দূরে থেকেই নমস্কার করৃতে পারে যদি না জীবিকার জন্য তার দরজায় দাঁড়াতে হয়। এই জন্য ইউরোপের পক্ষে তার মহাজন শ্রেণীটিকে কেবল টাকার খাতির দিয়ে দূরে রাখা সম্ভব নয়। কেননা এই শ্রেণীটিই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপের অন্নদাতা। আর তা দু'রকমে। নূতন শিল্প-ব্যবস্থায় দেশ জুড়ে' ধনস্থষ্টির যে সব ছোট খাট ব্যবস্থা ছিল তা লোপ পেয়েছে। একমাত্র কৃষি

ছাড়া ইউরোপের সমস্ত ধন প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হচ্ছে এই মহাজনদের বড় বড় কারখানায়। এবং কৃষি জিনিষটিও আজ ইউরোপের চোখে অতি অপ্রধান শিল্প। কারণ পশ্চিম ইউরোপ আবিষ্কার করেছে নিজের অন্ন দেশে জন্মানোর চাইতে কলের তৈরী শিল্প-সামগ্রী দিয়ে বিদেশ থেকে তা কিনে আনাই তার পক্ষে বেশী সহজ ও সুবিধার। এবং সে শিল্পের জন্য যে কৃষিলভ্য কাঁচামালের দরকার তার সম্বন্ধেও সেই কথা। ফলে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে মহাজনদের এই বড় বড় কারখানাগুলিতে ও তাদের আফিসে হাতে বা কলমে মজুরগিরি করা। অর্থাৎ—এই মহা শ্রেষ্ঠি সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা। আর পরোক্ষে ইউরোপের সবারই অন্নবস্ত্র এরাই যোগাচ্ছে। জীবন-যাত্রার যা কিছু উপকরণ তা হয় আস্‌ছে এদের কারখানা থেকে, নয় ত এদেরি কারখানার কলে তৈরী মালের বিনিময়ে। যাদের হাতে জীবন-মরণের কাঠি রয়েছে তারা যে সর্ব্বময় হ'য়ে উঠবে এতে আর বিস্ময় কি।

কিন্তু এ বৈশ্য-প্রভুত্বের সবচেয়ে যা প্রধান কথা তা হচ্ছে আধুনিক যুগের নূতন ব্যবস্থায় এই যে সব অতিকায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান মহাজনদের মূলধনে ও চেষ্টায় গড়ে' উঠেছে এগুলি যত লোকের অন্ন যোগাচ্ছে এর পূর্ব্বে ইউরোপের পক্ষে তা অসাধ্য ছিল। আর অন্ন বাড়্‌লে যে জীবও বাড়ে এটা প্রাণবিদ্যার একবারে প্রথম ভাগের কথা। ফলে গেল এক শ'

বছরের মধ্যে ইউরোপের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হ'য়েছে। এবং এখন এ বিরাট জনসঙ্ঘের জীবিকা যোগাতে হ'লে ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের চাকা একদিনও অচল হ'লে চল্‌বে না। এর আয়তন যদি একটু খাটো কি বেশ একটুকু মন্দা হয় তবে ইউরোপ তার সমস্ত লোকের মুখে আর অন্ন দিতে পার্‌বে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প—বাণিজ্যে যে লোক বেড়েছে, বিংশ শতাব্দীতে তাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হ'লে সেই শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া আর গতি নেই, এ যে কত সত্য জর্ম্মাণ যুদ্ধের এক আঁচড়েই তা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। যুদ্ধের ধাক্কায় এ শিল্প-বাণিজ্যের কল যেই একটু বিকল হ'য়েছে অমনি ইউরোপ জুড়ে কলরব; ইংলণ্ডে চিনি নেই, ফ্রান্সে কয়লা নেই, জর্ম্মাণীতে চর্ব্বির জন্য হাহাকার, অষ্ট্রিয়ায় দুধ না পেয়ে শিশু মর্‌ছে। আর একথা আরও স্পষ্ট হ'য়েছে, গেল-যুদ্ধের ফলে মূলধনী মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রকম-সকমে। রুষিয়ার বোলশেভিক, জর্ম্মাণীর সোস্যালিষ্ট, কি ইংলণ্ডের ন্যাশান্যালিজেশন্‌ পন্থী এমন কথা কারও মুখে ওঠেনি যে, এই যে আধুনিক ইউরোপের দৈত্যাকৃতি সব শিল্প-বাণিজ্য, যা কলের ও কাজের চাপে মানুষকে পিষে ফেল্‌ছে, একে ভাঙা দরকার। কেননা ইউরোপ মর্ম্মে মর্ম্মে জানে যে, এই শিল্প-বাণিজ্যই তার প্রাণ। একে মার্‌তে গেলে মর্‌তে হবে। তাই এখন সবারই লক্ষ্য কি করে' এই শিল্প-বাণিজ্যকেই বহাল ও সচল রাখা চলে, কিন্তু তার বর্ত্তমান মালিক মহাজনদের ছেটে ফেলা যায়। এ

চেষ্টা সফল হবে কিনা তা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। কিন্তু যতদিন না হবে, ততদিন বৈশ্য ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথায় চড়েই থাকবে। কেননা ইউরোপের মুখের অন্ন তার হাতের মুঠোয়।

(৪)

বলা বাহুল্য ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের বেগ কেবল ইউরোপ বা ইউরোপীয়ান জাতিগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নেই; পৃথিবীময় সে নিজকে জানান দিচ্ছে। কেননা ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর প্রভু। এবং স্বভাবতই এ প্রভুত্বের প্রয়োগ হচ্ছে ইউরোপের প্রভু বৈশ্যের মারফত, তারই সুবিধা ও প্রয়োজন মত। ইউরোপের বিজ্ঞান আজ বাহুবলে ইউরোপকে অজেয় ও দুর্নিবার করেছে। এবং সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইউরোপের জিত রাজ্য। কিন্তু এ জয় অশ্বমেধের রাজচক্রবর্ত্তীর জয় নয়। যুদ্ধের উল্লাস কি জয়ের গৌরব এর লক্ষ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল জিত দেশ ও পরাজিত জাতিকে ইউরোপের কারখানার কলের চাকায় জুড়ে দেওয়া। যে শিল্প-বাণিজ্য ইউরোপকে অন্নবস্ত্র দিচ্ছে ইউরোপের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ তার চাই-ই চাই। সেখানকার মাটীর রস টেনেই ওরা বেঁচে রয়েছে। যে কাঁচামাল কলে-তৈরী শিল্পে পরিণত হবে, তা প্রধানত আসছে ইউরোপের বাইরে নন্-ইউরোপীয়ান লোকদের দেশ থেকে। জীবনযাত্রার যে সব উপকরণ, বিশেষ করে' খাদ্য, যা ইউরোপের মাটীতে জন্মে না বা কলে গড়া চলে

না, তাও বেশীর ভাগ আনতে হবে ওখান থেকেই। অবশ্য এ দুই জিনিষ ইউরোপ গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চায় না। তার কারখানার তৈরী শিল্পের বিনিময়েই কিনতে চায়। কিন্তু এদের জোগান যাতে অব্যাহত, আর পরিমাণ যাতে প্রয়োজনমত হয় সে ব্যবস্থা তাকে কর্‌তেই হবে। কেননা কারখানার কল একদিনও বসে থাকলে চল্‌বে না। সুতরাং এসব গরম দেশের অলস লোকেরা যদি নিজের ইচ্ছায়, অথবা লাভের লোভে এসব জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করে' সুবিধা দরে জোগান দিতে না চায় তখন ইউরোপকে বাধ্য হ'য়েই হাতে চাবুক নিতে হয়, সঙ্গিনের খোঁচায় এদের কাজের ইচ্ছাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। এমন কি দু'চারজনার হাত পা' কেটে দিয়ে তাদের বাকী সঙ্গীদের হাত পা'গুলো যাতে কলের চাকার বেগের সঙ্গে তাল রাখ্‌তে উৎসাহী হয় সে চেষ্টা থেকেও পশ্চাৎপদ হ'লে চলে না। জর্ম্মাণ অধ্যাপক নিকলাই তাঁর 'যুদ্ধ ও জীবতত্ত্ব' নামের পুঁথিতে লিখেছেন যে, পৃথিবীর পঞ্চাশ কোটী ইউরোপীয়ান ও ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে-পড়া শ্বেত মানুষের হাতে এখনি এমন যন্ত্রপাতি আছে যে, আস্‌ছে বিশ বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর এক শ' কোটী নানা জাতির অ-শ্বেত মানুষদের একেবারে নির্ম্মূল করে' উচ্ছেদ কর্‌তে পারে। এবং ফলে সমস্ত পৃথিবীটা কেবলমাত্র, অন্তত নিজেদের চোখে, উন্নততর শ্বেত জাতিদেরই বাসস্থল হয়। এ বিশ বছরের পরে, অর্থাৎ—যখন চীন তার সমস্ত লোককে আধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষিত করে' তুল্‌বে, এবং নিজের

'ড্রেডনট' ও কামান গোলা নিজেই তৈরী কর্‌তে সুরু কর্‌বে, যেমন এখন জাপান কর্‌ছে, হয়ত এ আর সম্ভব হবে না। কিন্তু ইউরোপ যে এ কাজে হাত দেবে না তা নিশ্চয়, কেননা ব্যাপারটা এমন ভয়ানক যে কল্পনায় তাকে ফুটিয়ে তুল্‌লেই পিছিয়ে আস্‌তে হয়। এবং অধ্যাপক নিকলাই-এর মতে এ জেহাদ প্রচার করা মানে স্বীকার করা যে প্রকৃত জীবনযুদ্ধে, যেখানে জয়ী হ'তে হয় পরকে মারার শক্তিতে নয়, নিজের বাঁচার শক্তিতে, শ্বেতের চেয়ে অ-শ্বেত শ্রেষ্ঠ। সুদূর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় এখানে একটা হাতের কাছের মোটাকথা চোখ এড়িয়ে গেছে। ইউরোপ যদি আস্‌ছে বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব অ-শ্বেত জাতিগুলিকে উচ্ছেদ কর্‌তে সমর্থ হয় তবে তার পরের দশ বছরের মধ্যে ইউরোপ আর বর্ত্তমান ইউরোপ থাক্‌বে না। তার কল-কারখানার বেশীর ভাগই অচল হবে। তার শিল্প-বাণিজ্য সমাজ-রাষ্ট্র সব ব্যবস্থারই মূলে টান পড়্‌বে। কারণ পৃথিবী জুড়ে শস্যক্ষেত্রে, মাঠে, অরণ্যে যে সব কৃষ্ণ, তাম্র, পীত হাত দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে ইউরোপের সভ্যতার স্থূল শরীরকে স্থূলতর করে তুল্‌ছে তার সবগুলিকে যদি শাদা হাত দিয়ে বদল কর্‌তে হয় তবে কারখানার কলে দেবার মত হাত ইউরোপে আর বেশী অবশিষ্ট থাকে না। ইউরোপের লোক-সংখ্যার ইউরোপে বসে' অন্নসংস্থান অসম্ভব হয়। যে সব ভিত্তির উপর ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটা প্রধান হ'ল নন্‌-ইউরোপীয়ান ও অ-শ্বেত লোকদের পরিশ্রমের

ফল সহজে ও স্বল্প মূল্যে পাওয়া। প্রাচীন গ্রীক-রোমান পণ্ডিতেরা দাসের শ্রম বাদ দিয়ে নিজেদের সভ্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারতেন না। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে পারেন তার কারণ নামরূপের বদল ঘটালে জানা-জিনিষ চিনতে পণ্ডিতদের কষ্ট হয়; আর মনে যা ওঠে তা স্পষ্ট করে' খুলে বলার অভ্যাস প্রাচীন পণ্ডিতদের যত ছিল আধুনিক পণ্ডিতদের তা নেই।

ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের খোঁচা এমনি করে' ইউরোপের বাইরে তাম্র কালো পীত সব রং-এর লোকের গায়ে এসেই বিঁধছে। ইউরোপের বৈশ্য চায় এরা নিরলস হ'য়ে তার কারখানার কাজের উপাদান আর মজুরের খাদ্য যোগায়। কিন্তু এ ছাড়া এর আরও একটা দিক আছে। ইউরোপ যেমন এদের কর্ম্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায় এ কর্ম্মক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে না ওঠে এবং বিপথে না চলে। শিল্পের উপাদান যোগান এবং কৃষি পশু থেকে খাদ্য উৎপাদন, এতেই নিঃশেষ না হ'য়ে যদি এদের শক্তি ও বুদ্ধি নব শিল্পের নূতন বিদ্যা শিখে উপাদানকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করার দিকে চলে সেটা ইউরোপের চোখে অমঙ্গল। কেননা ইউরোপের আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের মোটকথা বাকী পৃথিবী উপাদান ও খাদ্য যোগাবে, আর ইউরোপ ঐ উপাদান থেকে তৈরী শিল্পদ্রব্যের এক অংশ বিনিময়ে ফিরিয়ে দেবে। যদি এ ব্যবস্থা উল্টে গিয়ে খাদ্য ও শিল্পসামগ্রী দুই-ই বাইরে থেকে ইউরোপের দরজায় উপস্থিত

হয় তবে বদল দিয়ে এদের ঘরে নেবার মত জিনিষ ইউরোপের বড় বেশি থাকৃবে না। কেননা ইউরোপ যে শিল্প-বাণিজ্যে আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে সে তার দেশের প্রকৃতির গুণে নয়, লোকের প্রকৃতির গুণে। কিন্তু এ কথা যেমন গৌরবের তেমনি আশঙ্কার। যে সব দেশে প্রকৃতি ইউরোপের চেয়ে অকৃপণা, সে দেশের লোকের মনের পঙ্গুত্ব ও শক্তির খর্ব্বতার উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব টিকে আছে। মন সচল হ'লে যে ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্যের নূতন কৌশল শিখে শক্তিসঞ্চয়ে দেরী হয় না তার পরিচয় জাপান দিয়েছে। এবং যেখানেই এ পরিচয়ের আভাস পেয়েছে, ইউরোপ তার নাম দিয়েছে 'আতঙ্ক'। কারণ ইউরোপের বিশ্বপ্রেমিকেরা যা-ই বলুন না, ধন ও শক্তিতে ইউরোপ এখন যেমন আছে তেমনি থাকৃবে, আবার বাকী পৃথিবীটাও ধনী ও শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌বে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এর কোনও সম্ভাবনা নেই। ইউরোপ প্রধান হয়েছে, আর সবাই ছোট ও খাটো আছে বলে'। সে প্রাধান্য বজায় থাকৃবে—আর সবাইকে ছোট ও খাটো করে' রাখ্‌তে পার্‌লে।

(৫)

বৈশ্য-ইউরোপের চাপ পৃথিবীর যে সব প্রাচীন সভ্য জাতি-গুলির উপর এসে পড়েছে তাদের সবারই মনে হয়েছে ওর হাত থেকে রক্ষার উপায় ঐ বৈশ্যত্বকে ধার করে' তার উপর শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়া। কেননা চোখে দেখতে ইউ-

রোপের বাহুতে বল দিচ্ছে- তার সব অদ্ভুত কৌশলী কাজের সরঞ্জাম ও উপকরণের বিচিত্র বাহুল্য। আর এ সরঞ্জাম ও উপকরণ সবই যোগাচ্ছে তার বৈশ্যের কর্ম্মব্যবস্থা। প্রাচ্য দেশের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচ্য জাপান পাশ্চাত্যের এই কর্ম্ম-কৌশল অল্পদিনেই আয়ত্ত করেছে। এবং ফলে পশ্চিম ইউ-রোপের প্রবল জাতিগুলির মত ইউরোপের চোখে সেও একটা প্রধান জাতি। তারও কারখানার কলে ইউরোপের মত মজুর খাটিয়ে শিল্প-সামগ্রী তৈরী হচ্ছে; সেগুলো জাহাজে উঠে পৃথিবীর বাজারের যত ফাঁক জায়গা দরকারী, অদরকারী, সাচ্চা, ঝুঁটো, ভারী ও ঠুন্‌কো মালে ভরে' দিচ্ছে, এবং আর সবার মাল সরিয়ে নিজের জন্য কতটা জায়গা খালি করা যায় তার চেষ্টা দেখ্‌ছে। মহাজনী-জাহাজের পেছনে তারও মানোয়ারী জাহাজ সেজে রয়েছে; এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য ইউরোপের আর পাঁচজন শান্তিপ্রয়াসীর মত সেও কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি তৈরী করে' যাচ্ছে। বিশ্বহিতের বাণী তার মুখ থেকেও সমান তেজে ও সমান বেগেই বেরুচ্ছে; এবং মানবজাতির সভ্যতা রক্ষা ও বিস্তারের জন্য দুর্ব্বল জাতির সুফলা দেশের গুরুভার বহনে তার পীত-স্কন্ধের ঔৎসুক্য কোনও শ্বেত-স্কন্ধের চেয়ে কম নয়। বৃদ্ধ চীন ডাইনে ইউরোপ ও বাঁয়ে জাপান দু'দিক থেকে খোঁচা খেয়ে এ বৈশ্যত্বের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাচ্ছে। কিন্তু তার প্রাচীন সভ্যতার গভীর শিকড়, আর প্রকাণ্ড দেহের বিরাট বিপুলতা তাকে সোজাসুজি ইউরোপের বৈশ্যত্বের

পাঠশালায় ঢুকতে দিচ্ছে না। ইউরোপের নবীন বিত্তার বেগ তার প্রাচীন সভ্যতাকে একটা নূতন সৃষ্টির পথে নিয়ে যাবে, এশিয়া সেই আশায় তাকিয়ে আছে। এবং সমস্ত বাধা কাটিয়ে পাছে চীন নিজের বৈশ্যমন্ত্রে জাপানের মতই সিদ্ধিলাভ করে সেই আতঙ্কে ইউরোপ মাঝে মাঝে চার দিক হল্‌দে দেখ্‌ছে।

আমাদের ভারতবর্ষ এ বৈশ্য-তন্ত্রের খাস তালুক। কেননা এ মহাদেশ ইউরোপের সেই দেশের অধীন রাজ্য যেখানে বৈশ্য-তন্ত্রের মূর্ত্তি সবচেয়ে প্রকট, আর বৈশ্য-প্রভুত্বের মহিমা সবচেয়ে উঁচু। এবং 'কন্‌ষ্টিটিউশন্যাল্‌ ল'র পুঁথিতে যা-ই থাকুক আমরা সবাই জানি ব্রিটেনের বৈশ্যরাজই আমাদের রাজা। স্বভাবতই প্রজার জাতির চোখে উন্নতি মানে রাজার জাতির মত হওয়া। সেই জন্য আমাদের দুঃখ, দৈন্য, দুর্দ্দশার কথা যখনি ভাবি তখন সহজেই মনে হয় এর প্রতিকারের উপায় ভারতবর্ষকে বিলাতের মত বড় বড় কারখানায় ভরে' ফেলা; দেশের লোককে গ্রামের মাটি থেকে উপ্‌ড়ে এনে সহরের কলে জুড়ে দেওয়া। এবং সেজন্য সর্ব্বপ্রথম দরকার সকলে মিলে বৈশ্যকে দেশের মাথায় তোলা যাতে যার-ই মগজে বুদ্ধি আর মনে উৎসাহ আছে তার দু'চোখ এদিকে পড়ে। আমাদের সরকারী বে-সরকারী রাজপুরুষেরাও ভারতবর্ষের যে-জাতি বৈশ্যমহিমা যতটা আয়ত্ত করেছে তাকে ততটা উন্নত বলে' স্বীকার ও প্রচার করেন। এবং আমাদের বড় ছোটর প্রমাণ যে তাঁদের হাতের মাপকাঠি সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাধ্য হ'য়েই স্বীকার করতে হবে যে এ মাপে বাঙালীর উন্নতির বহর বড় বেশী নয়। আরব সমুদ্রের তীরের দুই একটি জাতির কাছে ত আমরা দাঁড়াতেই পারি নে। এমন কি যাঁরা বাঙলার বাইরে থেকে কেবল পাগ্ড়ী কি টুপি নিয়ে এসে বাঙলার বুকের উপর দিয়ে মোটর হাঁকাচ্ছেন, তাঁদের পাশেও আমরা নিতান্ত খাটো। আমাদের নিত্য দুঃখ-দৈন্যের চাপটা যখনি কোনও নৈমিত্তিক কারণে একটু বেড়ে ওঠে তখনি এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের আন্দোলন, আলোচনা, ধিক্কার, অনুশোচনার সীমা থাকে না। কলেজ-ফেরত বাঙালীর ছেলে নিরক্ষর অ-বাঙালীর ব্যবসায়ে কেরাণীগিরির উমেদার, এই উদাহরণ তুলে' আমরা বাঙালীর মতি গতি এবং সর্ব্বোপরি আমাদের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দুরবস্থা স্মরণ করে' যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠি। এ শিক্ষা যে কেবল ব্যর্থ নয়, উন্নতির পথে পায়ে শিকল তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কেননা শিক্ষিত বাঙালীর চেয়ে যে নিরক্ষর দীল্লিওয়ালা শ্রেষ্ঠ এর পরিচয় ত একের মোটরকার ও অন্যের ছেঁড়া জুতোতেই সুপ্রকাশ। কিন্তু বাঙালীর মনের এমনি মোহ যে এর প্রতিকারে কেউ ইস্কুল কলেজ তুলে' দেবার উপদেশ দেয় না। প্রস্তাব হয় এগুলিতে অন্য রকম শিক্ষা দেওয়া হোক। শিল্পবিদ্যালয় ও কারবার শেখার ইস্কুলে দেশটা ভরে' ফেলা যাক্। অথচ সকলেই জানি মোটরবিহারী দীল্লিওয়ালা কি শিল্প, কি সওদাগরি কোনও ইস্কুলেই কোন দিন পড়েনি।

জর্ম্মাণযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে পৃথিবী-জোড়া দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙালাদেশের অবস্থা অতি সঙ্কটের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এ সঙ্কট যে কত বড়, আর আমাদের দারিদ্র্যের ব্যাধি যে কত প্রবল তা আমরা এর যে সব বিষ-চিকিৎসার ব্যবস্থা দিচ্ছি তা দেখ্‌লেই বোঝা যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'সবাই মাড়োয়ারী হও ; আর উপায় নেই।' এ কথা বেরিয়েছে তাঁর মুখ থেকে যাঁর সমস্ত জীবন বৈশ্যত্বের একটা প্রতিবাদ। ধনের গৌরব ও ক্ষমতার মোহ যাঁর কাছে প্রলোভনের জিনিষই নয়। যাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য আর ঋষির তপস্যা বিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ভারতবর্ষেও জ্ঞানের তপোবন ও শিষ্যের মণ্ডলী গড়ে' তুলেছে। যিনি বিদ্যা ও প্রতিভা দিয়েছেন দেশের সেবায়, নিজেকে লোপ করে'। এ যুগে যিনি কারখানা গড়ে' তুলেছেন নিজের পকেট নয় দেশের মুখ চেয়ে। আর 'মাড়োয়ারী হওয়া' ব্যাপারটি কি তা গেল যুদ্ধের টানে সবার সামনে বে-আব্রু হ'য়েই দেখা দিয়েছে। মাড়োয়ারিগিরি হচ্ছে ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের কবন্ধ। ইউরোপের বৈশ্য পৃথিবীই লুট করুক, আর দেশের মাথায়ই চড়ে' বসুক, দেশকে সে ঠিকই অন্ন যোগাচ্ছে। আজকার ইউরোপের ধনসৃষ্টির সে যে মূল উৎস তাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু মাড়োয়ারিগিরি ধনসৃষ্টির পথ দিয়েই হাঁটে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ঐ উত্তমাঙ্গটি তার নেই। তার কাজ হ'ল বিদেশের তৈরী জিনিষ চড়া দরে দেশের মধ্যে চালান, আর

দেশের উৎপন্ন ধন সস্তা দরে বিদেশীর হাতে তুলে' দেওয়া। এবং এই হাত বদলানোর কারবার থেকে যত বেশী সম্ভব দেশের ধন, যার সৃষ্টিতে তার কড়ে' আঙ্গুলেরও সাহায্য নেই, নিজের হাতে জমা করা। সে জন্য যে তীব্র লোভ ও একাগ্র স্বার্থপরতা দরকার তার নাম ব্যবসা-বুদ্ধি! এ ব্যবসা-বুদ্ধি যে কত বড় নির্ল্লজ্জ আর কতদূর হৃদয়হীন গেল-যুদ্ধের সময় পৃথিবীর সব দেশে তা প্রমাণ হয়েছে। দেশের নিতান্ত দুর্দ্দশা ও সঙ্কটের সময়ও দেশ-জোড়া দুরবস্থার ভিত্তির উপর নিজের ধনের ইমারত গড়ে' তুল্‌তে কোনও দেশের কোনও বৈশ্য কিছুমাত্র গ্লানি বোধ করেনি। এবং এক রাজদণ্ডের শাসন ছাড়া এদের নিষ্ঠুরতা আর কোনও কিছুরই বাধা মানেনি।

ধনসৃষ্টির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক সওদাগরী ইউরোপেও যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেখানে সেটা ধন উৎপাদন ও ধন বিতরণের আনুষঙ্গিক উপদ্রব। আর মাড়োয়ারিগিরি হ'ল নিছক উপদ্রব। জমিদারীর সঙ্গে মোসাহেব থাকে জানি; কিন্তু জমিদারী নেই, আছে কেবল মোসাহেবের উৎপাত এটা যেমন হাস্যকর তেমনি সঙ্কটজনক। দেশের কৃষক নিরন্ন বলে' স্বল্প মূল্যে তার শ্রমের ফল হাতে জমা করে' দেশের লোক নিরুপায় বলে' চড়া দামে তা বিক্রী করার মধ্যে কোথায় যে দেশের ধনবৃদ্ধি ও উপকার আছে তা অর্থ-নীতিশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়েরাও আবিষ্কার কর্‌তে পারবেন না। আর গলা যদি নেহাৎ-ই কাটা যায় তবে ছুরিটা বাঙালীর না হ'য়ে অ-বাঙালীর এতে এমন কি ক্ষুব্ধ হবার

কারণ আছে। সম্ভাবনাটা সুদূর, কিন্তু যদি সত্যই বাঙলার গোটা শিক্ষিত-সমাজটা 'মাড়োয়ারী'ই হ'য়ে ওঠে তবে নিশ্চয় জানি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রই সবার আগে বলবেন এর চেয়ে বাঙালীজাতির না খেয়ে মরাই ভাল ছিল।

(৬)

ইউরোপের বৈশ্যত্ব বাঙলার মাটিতে ভাল ফলেনি। অথচ ইউরোপের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ভারতবর্ষের সব জাতির চেয়েই বেশি। বাঙলার বাইরে বাঙালী ত একরকম খৃষ্টান বলেই পরিচিত। কথা এই যে, যে ইউরোপের সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর যোগ সেটা বৈশ্য ইউরোপ নয়, ব্রাহ্মণ ইউরোপ। কল-কব্জা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের আধুনিক ইউরোপ ছাড়াও আর একটা আধুনিক ইউরোপ আছে, যে ইউরোপ প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যে আধুনিক ইউরোপ মানুষের মনকে মুক্তি দিয়েছে; জ্ঞানের দৃষ্টি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি উদার করেছে। যার কাব্য, সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডার জ্ঞান, সত্য, সৌন্দর্য্যে ভরে' দিয়েছে। এই ইউরোপের আনন্দলোকই বাঙালীর মন হরণ করেছে, কলের ধোঁয়ায় কালো ইউরোপ নয়। সেই জন্য বাঙলার মাটিতে এখনও জামসেট্‌জী তাতা জন্মেনি, কিন্তু বাঙলা দেশ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি। এখনও বড় কলওয়ালা কি ভারি সওদাগরের আমরা নাম করতে পারি নে, কিন্তু জগদীশ বসু

ও প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালী জাতির মধ্যেই জন্মেছেন। বাঙালীর নাড়ীতে পশ্চিম থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ও মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতা, দক্ষিণ থেকে দ্রাবিড় ও পূর্ব্ব থেকে চীন সভ্যতার রক্ত এসে মিশেছে। ইউরোপীয় আর্য্য-সভ্যতার বিদ্যুৎস্পর্শে যদি এই অপূর্ব্ব প্রয়াগ-ভূমিতে আমরা একটি অক্ষয় নূতন সভ্যতা গড়ে' তুলে' মানবজাতিকে দান করতে পারি তবেই আধুনিক বাঙালী জাতির জন্ম সার্থক। না হ'লে আমরা পায়ে হেঁটে চলি কি মোটর গাড়ীতে দৌড়াই, তাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এ সার্থকতার জন্য ইউরোপের যে উৎস থেকে জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য উৎসারিত হচ্ছে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে যেখানে তার কারখানায় মাল তৈরী হচ্ছে সেখানে দু'চোখ বন্ধ করে' রাখ্‌লে চল্‌বে না ; বাঙালীর মাড়োয়ারী হওয়া একেবারেই পোষাবে না।

বাঙালীকে অবশ্য আগে বাঁচ্‌তে হবে। কিন্তু সে জন্য চাই নূতন ধন সৃষ্টি করা, দেশের অন্নকে বহু করা। বেদের ঋষি অন্নের সৃষ্টির জন্য নিজের হাতে হাল ধরেছেন। আজ পৃথিবীর সেই দিন এসেছে যখন অন্নসৃষ্টির ভার কেবল বৈশ্য বহন করতে পারে না। তার ব্রাহ্মণের সাহায্য চাই। এই সাহায্য বাঙালীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে দান করবে। যাঁর চোখ আছে তিনিই এর আরম্ভ দেখ্‌তে পেয়েছেন। বৈশ্যত্বের নামে নয়, এই ব্রাহ্মণত্বের নামে ডাক দিলে তবেই নবীন বাঙালীর সাড়া পাওয়া যাবে। এই ব্রাহ্মণত্বের ছায়ায় বাঙ্গলাদেশে

এমন বৈশ্যত্ব গড়ে' উঠুক যার হাতে ধন দেখে কি শাস্ত্রকার কি দেশের লোক কেউ ভীত হবে না। যে বৈশ্য প্রাচীন সংহিতার অনুশাসন মত "ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্", ধর্ম্মানুসারে দ্রব্যবৃদ্ধির জন্য উত্তম যত্ন করবে; "দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ", এবং অতি যত্নে সর্ব্বভূতকে পর্য্যাপ্ত অন্ন দান করবে।

শ্রাবণ, ১৩২৭

সবুজের হিন্দুয়ানী

সম্পাদক মহাশয় শুনেছেন অনেকের আশঙ্কা, নবপর্য্যায়ের 'সবুজ পত্র' নাকি হবে জীর্ণ হিন্দুয়ানীর আতপত্র। কথা কি ক'রে রট্‌লো বলা যায় না, তবে এ কথা বলা যায় যে, ভয় একেবারে অমূলক নয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বয়স হ'য়ে আস্‌ছে; আর প্রথম বয়সের ইংরাজী-পড়া তার্কিক যে শেষ বয়সে শাস্ত্রভক্ত গোঁড়া হিন্দু,—এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কাজেই যাদের ভাবনা হ'য়েছে পুনরুদ্গত 'সবুজ পত্র' আধুনিকতার প্রখর রশ্মি থেকে প্রাচীন হিন্দুত্বকে ঢেকে রাখ্‌বে, তাদের ভয়কে অহেতুক বলে' উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মটা খাটে না। কারণ তিনি কেবল ইংরাজীনবীশ নন, ইউরোপের আরও দু'একটা আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যনবীশ; যার ফলে ইংরেজী মদের নেশা কোনও দিনই তাঁকে বেসামাল কর্‌তে পারে নি। আর হিন্দুশাস্ত্রচর্চ্চাও তিনি শেষ বয়সে 'বঙ্গবাসী'র অনুবাদ মারফত আরম্ভ করেন নি, তরুণ বয়স থেকেই শাস্ত্রকারদের নিজ হাতের তৈরী খাঁটি জিনিষে নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে এসেছেন। এখন আর ওর প্রভাবে ঝিমিয়ে পড়্‌বার তাঁর কোনও সম্ভাবনা নেই।

এ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু হিন্দুত্ব ও হিন্দুশাস্ত্রের উপর চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তি যে গোঁড়া গদ্গদ্ ভক্তি নয়, তার যথার্থ কারণ এ দুয়ের উপর তাঁর অসীম প্রীতি, কেননা ওখানে তাঁর নিগূঢ় মমত্ববোধ রয়েছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ হ'লেও চৌধুরী মহাশয়ের শরীরে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের রক্তের ধারা কতটা অক্ষুণ্ণ আছে, এ নিয়ে হয়ত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তর্ক তুল্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও মনোভাব যে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রকারদের বুদ্ধি ও মনোভাবের অক্ষুণ্ণ ধারা, এতে আর তর্ক চলে না। শাস্ত্রকার মনু কি ভাষ্যকার মেধাতিথি, এঁদের সঙ্গে আজ মুখোমুখী সাক্ষাৎ হ'লে তাঁরা অবশ্য চৌধুরী মহাশয়কে নিজেদের বংশধর ব'লে চিন্‌তে পার্‌তেন না; বরং পোষাক পরিচ্ছদ, চাল-চলনে প্রত্যন্তবাসী কশ্চিৎ ম্লেচ্ছ বলেই মনে কর্‌তেন। কিন্তু দু'চার কথার আদানপ্রদানে টপ্‌হ্যাট ও ফ্রক্ কোটের নীচে যে মগজ ও মন রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় হবামাত্র তাঁরা নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয়কে এই বলে' আশীর্ব্বাদ কর্‌তেন :—

"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদাং শতম্।"

"হে পুত্র! আমাদের আত্মাই তোমাতে জন্ম পরিগ্রহ করেছে। তুমি শতবৎসর পরমায়ু নিয়ে অযজ্ঞীয় ম্লেচ্ছপ্রায় বঙ্গদেশে ইস্পাতের লেখনীমুখে আর্য্যমনোভাব প্রচার ও তার গুণ কীর্ত্তন কর।"

এই আর্য্যমনোভাব বস্তুটি কি, একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক্।

কারণ প্রমথবাবু যদি 'সবুজ পত্রে' হিন্দুয়ানী প্রচার করেন, তবে এই মনোভাবেরই প্রচার কর্‌বেন।

যে প্রাচীন আর্য্যেরা হিন্দুসভ্যতা গড়েছে, তাদের সকলের মনোভাব কিছু এক রকম ছিল না। হিন্দুসভ্যতার জটিল বৈচিত্র্য দেখ্‌লেই তা বোঝা যায়। যারা উপনিষদ রচেছে ও যারা ভক্তিশাস্ত্র লিখেছে; পুরুষার্থ সাধন বলে' যারা যাগযজ্ঞ-বিধির সূক্ষ্ম বিচার ও বিচারপ্রণালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছে; ও যারা চতুরার্য্য সত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ করেছে; যারা শ্রুতিকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের পরম প্রমাণ বলেছে; ও যারা বলেছে বেদ লোকযাত্রাবিদ্‌দের লোকনিন্দা থেকে রক্ষার আবরণ মাত্র (১); ন্যায়-দর্শন যাদের তত্ত্বপিপাসার নিবৃত্তি করেছে, ও যারা অখণ্ড অদ্বয়-বাদে না পৌঁছে থাম্‌তে পারে নি—তারা সবাই ছিল আর্য্য, এবং হিন্দুসভ্যতা গড়ার কাজে সবারই হাত আছে। এক দল অনুশাসন দিয়েছে গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবঋণ ও প্রজোৎপাদনে পিতৃঋণ শোধ দিয়ে তবে বানপ্রস্থী হ'য়ে মোক্ষ চিন্তা কর্‌বে, নইলে অধোগতি হবে; অন্য দল উপদেশ করেছে যেদিন মনে বৈরাগ্য জাগ্‌বে সেইদিনই প্রব্রজ্যা নেবে। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবৃদ্ধির উপায় রাজাকে শেখাবার জন্য এক দল 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেছে; অপর দল 'ধর্ম্মশাস্ত্র' লিখে সে পথ দিয়ে হাঁটতে রাজাকে মানা করেছে।

(১) "বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ, সংবরণ মাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি।" (কৌটিল্য, ১।২)

কেউ বলেছে পুত্রের জন্মমাত্র সে পৈতৃক ধনে পিতার মতই স্বত্ব লাভ করে, কেউ বিধান দিয়েছে পিতা যতদিন বেঁচে আছে পুত্রের ততদিন কোনও স্বত্ব নেই। যে লৌকিক প্রবচন বলে, এমন মুনি নেই যাঁর ভিন্ন মত নেই, তার লক্ষ্য হিন্দু-সভ্যতা-স্রষ্টাদের এই মতবিরোধের বৈচিত্র্য।

এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই, বিশেষত্বও কিছু নেই। যে-কোনও বড় সভ্যতার মধ্যেই এই বিবোধ ও ভেদ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। সভ্যতা হ'ল মনের স্বচ্ছন্দ লীলার সৃষ্টি। বহু মনের লীলাভঙ্গী বিচিত্র না হ'য়ে যদি সৈন্যের কুচের মত একেবারে একতন্ত্র হ'ত, তবে সেইটেই হ'ত অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু তবুও যখন জাতি-বিশেষের নামে কোনও সভ্যতার নামকরণ করি, যেমন হিন্দুসভ্যতা,—তখন যে কেবল এই খবর জানাতে চাই যে, কতকগুলি বস্তুজগতের ও মনোরাজ্যের সৃষ্টি বংশপরম্পরাক্রমে মোটামুটি এক জাতির লোকের কাজ, তা নয়। প্রকাশ্য বা নিগূঢ়ভাবে এই ইঙ্গিত প্রায় সকল সময়ে থাকে যে, ঐ সব বিচিত্র, বিভিন্ন, এমন কি বিরোধী সৃষ্টিগুলির মধ্যে একটা ঐক্যের বাঁধন আছে, যে ঐক্য কেবল জন্মস্থান-সমতার ঐক্য নয়, ভারগত ও রুচিগত ঐক্য। খুব সম্ভব এ ঐক্যের মূল ঐ জন্মগত ঐক্য। কারণ ঐ সৃষ্টিগুলির যারা কর্ত্তা, তাদের শিরার রক্ত ও মাথার মগজের এক মূল জীব থেকে উৎপত্তি, এবং তাদের প্রাকৃতিক ও মানসিক পারি-পার্শ্বিকও অনেক অংশে এক। অতিবড় প্রতিভাশালী স্রষ্টাও

এর প্রভাব এড়াতে পারে না ও এড়াতে চায় না। ফলে তাদের সৃষ্ট সভ্যতা তার বহুমুখী বৈচিত্র্য ও নানা পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও ভিতরের কাঠামোখানি প্রায় বাহাল রাখে। ঘরের চাল বদ্‌লে যায়, দরজা জানালার পরিবর্ত্তন হয়, পুরানো বেড়া তুলে' ফেলে নতুন বেড়া বসান হয়, কিন্তু মাঝের 'ফ্রেম্'টি বজায় থাকে। আর্য্যমনোভাব হিন্দু-সভ্যতার এই 'ষ্টীলফ্রেম'।

বলা বাহুল্য এ 'ষ্টীলফ্রেমে'র শলাকা চোখে দেখা যায় না। চুম্বকের 'লাইন্‌স্ অব্ ফোর্সে'স্' শক্তিসঞ্চার পথের মত সেগুলি অদৃশ্য। তাদের উপাদান কোনও বস্তুসমষ্টি নয়, এমন কি রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও নয়। চিন্তা বা মননের কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গী, ভাব ও অনুভূতির কয়েকটি বিশেষমুখী প্রবণতা দিয়ে এ 'ফ্রেম' তৈরী। সুতরাং আর্য্যমনোভাব জিনিষটিকে রূপরেখায় চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রত্যক্ষ পরিচয় হ'লে এ মনোভাবের যে সুস্পষ্ট ছবি মনে এঁকে যায়, ভাষায় তার মূর্ত্তি গড়া সুদক্ষ শিল্পীর কাজ। সে অনধিকার চেষ্টায় উদ্বাহু না হ'য়ে শাদা কথায় তার দু'একটা লক্ষণের কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা মাত্র কর্‌বো।

ইংরেজীতে যাকে 'সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্' বলে, আমরা তার বাঙ্গলা নাম দিয়েছি ভাবালুতা। ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে বিগত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছর ছিল এই ভাবালুতার

পুরো জোয়ারের সময়। উনবিংশ শতাব্দীর যে ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্যে তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন পুষ্ট হচ্ছিল, সে কাব্য সাহিত্য 'সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্'-এর রসে ভরা; স্থতরাং তার প্রেরণায় বাঙ্গালী যে সাহিত্য স্থষ্টি কর্‌ছিল, তা ভাবালুতায় ভরপুর। এবং প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের মাত্র যে অংশের তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর প্রভাব ছিল, সেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যও এই ভাবালুতার অনুকূল। এই মানসিক আবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত হ'য়ে প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের যে লক্ষণ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চোখ ও মন সব চেয়ে সহজে ও সবলে আকর্ষণ করেছে, সে হচ্ছে 'সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্' বা ভাবালুতার অভাব; এবং কেবল অভাব নয়, বিরোধী ভাবের আধিপত্য। কারণ প্রাচীন হিন্দুর মনোভাবে এমন একটা ঋজু কাঠিন্য ছিল, যা কি শরীর কি মনের সমস্ত রকম মুইয়ে-পড়া ও লতিয়ে-চলার বিরুদ্ধ। কালিদাস আর্য্যরাজার মৃগয়াকর্ষিত শরীরের যে ছবি এঁকেছেন, সেটা প্রাচীন আর্য্যমনেরও ছবি।

"অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি।"

"মেদহীন কৃশতা ঋজু দীর্ঘতায় কৃশ বলে' লক্ষ্য হয় না। পর্ব্বতচারী গজের মত দেহ যেন কেবল প্রাণের উপাদানেই গড়া।" অথচ এই মেদশূন্য কৃশতা কল্পনা-অকুশল মনের বস্তু-তান্ত্রিক রিক্ততা নয়। হিন্দুর বিরাট পুরাণ ও কথাসাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন গাথার বিপুলতা ভারতীয় আর্য্যমনের অফুরন্ত

কল্পনালীলার পরিচয় দিচ্ছে। এ কাঠিন্যও শুষ্কপেশী কঙ্কালসার কাঠিন্য নয়। ভাবের দীনতা, রসবোধ ও রসসৃষ্টির অক্ষমতা জাতির মনকে বিধিনিষেধ-সর্ব্বস্ব যে শুষ্ক কঠিনতা দেয়, সে কাঠিন্য হিন্দুর কখনও ছিল না। বেদসূক্তের উষার বন্দনা থেকে ভর্ত্তৃহরির শতকত্রয় পর্য্যন্ত ভাব ও রসের সহস্র ধারা তাকে পাকে পাকে ঘিরেছে। তার ভোগকে শোভন ও জীবনযাত্রাকে মণ্ডনের জন্য চৌষট্টি কলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমস্ত ভাব ও কল্পনা, রস ও কলাবিলাসের মধ্যে একটা সরল, কঠিন মেরুদণ্ড সব সময়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। প্রাচীন আর্য্যমনে ভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু আমরা যাকে বলি "ভাবে গলে' যাওয়া", তার মাধুর্য্য সে মনের রসনা আস্বাদ করে নি। ভগবান বুদ্ধ লোকের জন্মজরামরণের দুঃখে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, সম্পদ ছেড়েছিলেন, কিন্তু চোখের জল ছাড়েন নি।

পণ্ডিত লোকে এমনও বলেছেন যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি মূলে ছিল যাযাবর লুঠতরাজের দল—'প্রিডেটারি নোমাড্‌স্'। অন্য ধ্রুবশীল সভ্যজাতির ঘাড়ে চেপে তাদের পরিশ্রমের অন্ন খেতে খেতে তাদেরি সংস্পর্শে তারা ক্রমে সভ্য হ'য়েছে। এই ধার-করা সভ্যতার বীজ উর্ব্বরা জমীতে খুবই ফলেছে বটে, কিন্তু তার শিকড় আদিম যাযাবরত্বের প্রস্তরকঠিন অন্তর ভেঙ্গে মাটি করতে পারে নি, ফুলপাতায় ঢেকে রেখেছে মাত্র। এ মতের ঐতিহাসিক মূল্য যতটা থাক না থাক, এটি স্পষ্টই প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের একটা পৌরাণিক অর্থাৎ 'ইভলিউশনারি'

ব্যাখ্যা। একটি ছোট উদাহরণ দিই। নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রাচীন হিন্দুর প্রিয়বস্তু ছিল। হিন্দু আলঙ্কারিকেরা কাব্যের মধ্যে নাটককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাঁদের শিল্পকলার সংখ্যাও গণনায় চৌষট্টি পর্য্যন্ত পৌছেছিল। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র একযোগে বিধান দিয়েছে—কারুকর্ম্ম ও কুশীলবের কর্ম্ম শূদ্রের কাজ, আর্য্যের নয়।(১)

উদাহরণে পুঁথি বেড়ে যায়। কিন্তু আর্য্যমনের এই কাঠিন্য যে কত কঠোর, তা তাঁরা নিজেদের জীবনের অপরাহ্ন-কালের জন্য যে দুটি আশ্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার কথা একটু কল্পনা করলেই উপলব্ধি হয়।

> "গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
> অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥"
>
> (মনুঃ, ৬।২)

"গৃহস্থ যখন দেখ্‌বে গায়ের চামড়া শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে, চুলে পাক ধরেছে, ও পুত্রের পুত্র জন্মেছে", অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের অপটু শরীরে গৃহের ছোটখাটো সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পুত্র পৌত্রের সেবা ও শ্রদ্ধা সব চেয়ে কাম্য হ'য়ে এসেছে, "তখন ঘর ছেড়ে বনে প্রস্থান করবে।" হ'তে পারে সে বন খুব বন্য ছিল না। কিন্তু পুরাতন প্রিয় গৃহ ও সমাজের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্বন্ধচ্ছেদের নির্ম্মমতাতেই তা ভীষণ।

(১) "শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রূষা বার্ত্তা কারুকুশীলবকর্ম্ম চ"—(কৌটিল্য, ১।৩)

"ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি মূলানি চ ফলানি চ॥"
(মনুঃ, ৬।১৬)

"ভূমিকর্ষণে যা জন্মেছে, পড়ে পেলেও তা আহার করবে না। আর্ত্ত হ'লেও গ্রামজাত ফলমূল গ্রহণ করবে না।" এই বনবাসে উগ্র তপস্যায় নিজের দেহ শোষণ করাই ছিল বিধি।

"তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ।" (মনুঃ, ৬।২৪)

কিন্তু মৃত্যুকে অভিনন্দন ক'রে এ জীবনেরও সংক্ষেপ কামনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥"
(মনুঃ, ৬।৪৫)

"মরণকেও কামনা করবে না, জীবনকেও কামনা করবে না। ভৃত্য যেমন ভৃতিপরিশোধের অপেক্ষা করে, তেমনি কালের অপেক্ষা করবে।"

বানপ্রস্থের উপর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কতটা অনুরাগ আছে জানিনে, কিন্তু মনের যে বীর্য্য নিজের বার্দ্ধক্য-দশার জন্য এই বানপ্রস্থের বিধান করেছিল, সেই বীর্য্য তাঁর মনকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আধুনিক হিন্দুর মনে প্রাচীন আর্য্যমনের এই বীর্য্য ফিরিয়ে আনতে চান। এবং বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা যদি reactionary হয়, তবে চৌধুরী মহাশয়কেও reactionary বলতে হবে।

হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্য্য কালবশে কমে আস্‌ছিল, এবং মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে কমার বেগ ক্রমে দ্রুত হ'য়ে এখন প্রায় লোপের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনের একটা কোমলতা, গুটিকয়েক রসে আবিষ্টতা ও ভাবে বিহ্বলতা, তার খালি জায়গা অনেকটা জুড়ে বসেছে। হিন্দুর সচল মন নিশ্চেষ্ট থাকে নি। এই নূতন মনোভাবের উপযোগী ধর্ম্মসাধনা, কাব্য ও দর্শন গড়ে' উঠেছে। বাঙ্গলাদেশে এর সাধক শ্রীচৈতন্য, কবি চণ্ডীদাস, দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী। প্রমথ বাবু যদি 'সবুজ পত্রে' প্রাচীন হিন্দুয়ানী প্রচারও কর্‌তে চান, তবে এই নবীন হিন্দুয়ানীর সঙ্গে তাঁকে লড়্‌তে হবে। কারণ 'পুরুষ ব্যাঘ্র বনাম মানুষ মেষ'-এর মামলায় তিনি যে বেদখল বাদীর পক্ষে সরাসরি একতর্‌ফা ডিক্রী পাবেন, এমন মনে হয় না। প্রথম ত তামাদি দোষ কাটাতে বেগ পেতে হবে। তারপর সভ্যতার ইতিহাসে বাঘের চেয়ে মেষ হয়ত সভ্যতর জীব। এবং 'দাসমনোভাবে'র চেয়ে যে, 'প্রভুমনোভাব' শ্রেষ্ঠ, তা'ও বিচার সাপেক্ষ। যাহোক, এ-তর্ক যদি প্রমথ বাবু সত্য সত্যই তুল্‌তে পারেন, তবে বাঙ্গলাসাহিত্যে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের একটা নতুন সংস্করণ অভিনয় হবে। কারণ অসম্ভব নয় যে, বাঙ্গলার তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে প্রাচীন হিন্দুর কতকটা কাঠিন্য ও বীর্য্য বিকট ছদ্মবেশে লুকান আছে।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বই প্রমথ বাবুর একমাত্র প্রতিমল্ল হবে না। বাঙ্গালীর ইংরাজী-শিক্ষিত মন আজকার দিনে অনেক

রকম 'সমন্বয়' সাধন করেছে। বৈষ্ণব আচার্য্যেরা যে রসতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, সে রস ইক্ষুরস। সাংসারিক ভোগসুখ, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সমস্ত পিষে ফেলে তবে সে রস নিঙ্‌ড়ে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের ইংরেজী শিক্ষায় 'একলেক্‌টিক্' মন ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের সঙ্গেও রসতত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছে। আফিস, আদালত, শেয়ার মার্কেট, খবরের কাগজ, এ সব বাহাল রেখেই আমরা ও-রস ভোগ কর্‌ছি। অর্থাৎ ও-রস এখন আর ইক্ষুদণ্ডে বদ্ধ নেই, পেটেণ্ট করে' বোতলে পোরা হয়েছে। দিনের কাজের শেষে, কি ছুটির দিনে, খুব সুখে ও সহজে ওকে ঢেলে সম্ভোগ করা চলে। প্রাচীন হিন্দুর পক্ষ নিলে এ 'সমন্বয়ে'র সঙ্গে প্রমথ বাবুকে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বর্ণসঙ্করের বিরুদ্ধ হ'লেও আধুনিক বিজ্ঞান নাকি তার সপক্ষ। সুতরাং এ যুদ্ধ জেতাও সহজ হবে না। মোট কথা প্রাচীন হিন্দুয়ানীর যুদ্ধে লড়্‌তে হলে, প্রাচীন হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্য্যের প্রয়োজন হবে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মনে ও-গুণ আছে বলেই জানি। সুতরাং তিনি এতে সাহসী হ'লেও হ'তে পারেন।

ভাদ্র, ১৩৩২

ধর্ম্ম-শাস্ত্র

পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বলেন প্রাচীন হিন্দুর বুদ্ধিটা ছিল ঘোলাটে। যে-সব জিনিষ পরস্পর থেকে অতি স্পষ্ট তফাৎ, এরা তাদেরও ঘুলিয়ে এক করে' ফেলেছে। যেমন ধর্ম্ম আর আইন। এর একের সঙ্গে অন্যের কিছু সম্পর্ক নেই। এর একটি হ'ল ইহলোকের, অন্যটি পরকালের। একটির স্থান ধর্ম্মমন্দির, অন্যটির আদালত। একটির কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিত, ধর্ম্ম-যাজক; অন্যটির জজ কৌঁসিলি। অথচ প্রাচীন হিন্দু বলে, তার আইন তার ধর্ম্মেরই অঙ্গ। তার আদালত হচ্ছে ধর্ম্মাধিকরণ, তার জজ-জুরী হ'ল ধর্ম্মপ্রবক্তা। উত্তরে আমরা নব্য হিন্দুরা বলি—ঐ ত ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিশেষত্ব। ঐখানেই হিন্দুর হিন্দুয়ানী। অন্য সব জাতির স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে ভেদ আছে—কিন্তু হিন্দুর নেই। হিন্দুর যা 'অমূত্র' তাই 'ইহ'। তার সংসারযাত্রার প্রতি খুঁটিনাটি ধর্ম্মশাসিত। দাঁতমাজা থেকে ব্রহ্মধ্যান, সবই তার ধর্ম্মাচরণ। হিন্দু ধর্ম্মৈকপ্রাণ, ধর্ম্মসর্ব্বস্ব।

গল্প আছে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ নবপ্রতিষ্ঠিত 'রয়্যাল সোসায়টির' মুরব্বি হ'য়ে তার সভ্যদের প্রশ্ন করেছিলেন—বাঁচা মাছের চেয়ে মরা মাছ ওজনে ভারী কেন? সমিতির পণ্ডিতেরা ভেবে চিন্তে নানা জনে নানা কারণ দর্শালেন, কিন্তু কোনও

ব্যাখ্যাই সকলের তেমন মনঃপুত হ'ল না। শেষে একজন পণ্ডিত একটা বাঁচা মাছ এনে ওজন করে', মেরে তাকে আবার ওজন কর্‌লেন; ওজন বেশী দেখা গেল না। প্রাচীন হিন্দুকে নিয়ে পশ্চিমের পণ্ডিতের সঙ্গে নব্যহিন্দুর যে বিচার বিতর্ক, সেও এই ধরণের। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে-সব তথ্য প্রচার করেন, সেগুলি সত্য কি মিথ্যা, তা পরখ করে' দেখা আমরা দরকার মনে করি নে। মনে মনে বিশ্বাস আছে, এ সম্বন্ধে তাঁদের বাক্য আপ্তবাক্য। আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে সেই সব তথ্য থেকেই নানা তত্ত্ব বের করি, এবং তার বলে প্রমাণ করি, যে-সব কারণে তাঁরা হিন্দু-সভ্যতাকে বলেন খাটো, ঠিক সেই কারণেই হিন্দু-সভ্যতা সব চেয়ে উঁচু। তাঁরা বলেন প্রাচীন হিন্দু যে ধর্ম্ম থেকে আইনকে তফাৎ কর্‌তে পারে নি, তা'তেই প্রমাণ এ বিষয়ে তাদের সভ্যতা আদিম অবস্থা ছাড়িয়ে বড় বেশীদূর এগুতে পারে নি; কারণ সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ও-দুই জিনিষ একসঙ্গেই মিশে থাকে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমে তাদের পৃথক করে' নেয়। আমরা বলি প্রাচীন হিন্দুরা যে ধর্ম্ম থেকে আইনকে তফাৎ করে নি, তা'তেই প্রমাণ এ বিষয়ে তাঁরা সভ্যতার একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন; কারণ সভ্যতার চরম অবস্থায় মানুষ আইনের ধারা মান্‌বে ধর্ম্মবুদ্ধিতে, 'ল' যাবে 'মর‍্যালিটিতে' মিশে। এখন যদি প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন হিন্দুরা ধর্ম্ম ও আইন মোটেই মিশিয়ে ফেলে নি, ও-দু'জিনিষকে খুবই তফাৎ করে'

দেখেছে, এমন কি, এত তফাৎ করে' যে বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের আইনেও ধর্ম্ম ও আইনের তফাৎ তত বেশী নয়,* তবে মুস্কিল হয় এই যে, তা'তে কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য আঘাত পায় না, নব্যহিন্দুর হিন্দুয়ানীতেও ঘা লাগে।

হিন্দুর আইন যে হিন্দুর ধর্ম্ম থেকে পৃথক ছিল না, আর দন্তধাবন ও সত্যভাষণ দুই-ই যে তার ধর্ম্ম—পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও নব্যহিন্দুর এই বিশ্বাসের মূল একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সে প্রমাণ হচ্ছে, প্রাচীন হিন্দু একই শাস্ত্রে আইন, দন্তধাবন ও সত্যভাষণের ব্যবস্থা দিয়েছে; এবং সে শাস্ত্রের নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে যা আছে তাই যে হিন্দুর ধর্ম্ম, এতে আর কথা চলে না। এবং গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের এমন কোনও অবস্থা নেই, যার ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে নেই। সুতরাং হিন্দুর জীবনের প্রতি কাজ যে ধর্ম্ম এতে আর সন্দেহ কি। তাই বঙ্কিম বাবু অনেক আগেই বলেছেন হিন্দুর 'ধর্ম্ম' খৃষ্টানের 'রিলিজান' নয়। হিন্দুর ধর্ম্ম বড় ব্যাপক জিনিষ। এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 'ধর্ম্ম' মানে 'কাল্‌চার' অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম মানে 'হিন্দু কাল্‌চার'। কিন্তু 'ধর্ম্ম' কথাটা 'রিলিজান'-এর প্রতিশব্দ নয়, 'কাল্‌চারের' প্রতিশব্দ, এই আভিধানিক তথ্য নিয়ে ত হিন্দু-সভ্যতার ভালমন্দ বিচারের কোনও তর্ক ওঠে না। তর্ক যে উঠেছে তার কারণ, এ কথার মধ্যে একটু ইঙ্গিত আছে;

* জুলাই মাসের The Visva Bharati Quarterly পত্রিকায় The Spirit of Hindu Law প্রবন্ধে এ কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি।

এর অভিধা ছাড়িয়ে একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে। হিন্দুর 'ধর্ম্ম' 'রিলিজান' নয়, 'কাল্‌চার'; কিন্তু তার সমস্ত 'কাল্‌চার'টাই তার 'রিলিজান'। অর্থাৎ খৃষ্টানের গির্জায় গিয়ে হাঁটুগাড়ার সঙ্গে যে মনোভাব রয়েছে, হিন্দুর শৌচাচারের সঙ্গে সেই মনোভাবেরই যোগ রয়েছে। হিন্দুর 'রিলিজাস্‌' ও 'সেকুলার'-এর মধ্যে ভেদ নেই, কারণ সমস্ত সাংসারিক কাজও তাকে কর্‌তে হবে 'রিলিজাস্‌' মনোভাব নিয়ে। হিন্দু-সভ্যতার যদি এই আদর্শ হয়, তবে সেটা ভাল কি মন্দ তা' নিশ্চয়ই তর্কের বিষয়।

কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা। প্রাচীন হিন্দু 'সেকুলার' ও 'রিলিজাস্‌', ঐহিক ও পারত্রিক—এর মধ্যে প্রভেদ করে নি, এ তথ্য সম্পূর্ণ অমূল, টীকাকারদের ভাষায় 'শশবিষাণের মত অলীক'। ও দুয়ের মধ্যে যে ভেদের গণ্ডী তাঁরা টেনেছেন তা গভীর, যে প্রাচীর তুলেছেন তা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের নব্য-হিন্দুদের যদি তা চোখে না পড়ে, সে আমরা চোখ বুজে আছি বলে'। এবং চোখ চেয়ে দেখ্‌লে হয় ত বা মনঃক্ষুণ্ণ হব।

ধর্ম্মশাস্ত্রে 'ধর্ম্ম' কথার অর্থ কি, এ আমাদের মাথা ঘামিয়ে বের কর্‌তে হবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারেরা তা খোলাখুলিই বলে' গেছেন। তাঁরা বলেছেন, "ধর্ম্ম শব্দঃ কর্ত্তব্যতাবচনঃ" (১), যা কর্ত্তব্য, 'ধর্ম্ম' শব্দ তারি বাচক। "ধর্ম্ম শব্দঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যয়োর্বিধি প্রতিষেধয়োঃ......দৃষ্টপ্রয়োগঃ" (২),

(১) মেধাতিথি, ৭।১ (২) মেধাতিথি, ১।২

যা কর্ত্তব্য এবং যা অকর্ত্তব্য তার বিধি ও তার নিষেধ অর্থেই 'ধর্ম্ম' শব্দের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম মানে কর্ত্তব্য। মানুষের যত কিছু কর্ত্তব্য—পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ব্যক্তিগত ও 'রিলিজাস্'—এ সকলের সাধারণ নাম 'ধর্ম্ম'। এ সব বিভিন্ন কর্ত্তব্যের যে এক নাম, এবং এক শাস্ত্রে যে তাদের ব্যবস্থা, তার কারণ, ভিন্ন হ'লেও একই মানুষের ব্যক্তিত্বের অদ্বয় যোগ-সূত্রে তারা একসঙ্গে বাঁধা আছে। এ সব কর্ত্তব্যই একই মানুষের নানা সম্বন্ধ ও নানা সম্পর্কের কর্ত্তব্য। কিন্তু যেমন তাদের ঐক্য আছে, তেমনি ভেদও আছে। সব কর্ত্তব্যের মূল এক নয়, প্রমাণ এক নয়। সব কর্ত্তব্যই 'রিলিজাস্' নয়, কারণ 'রিলিজাস্' কর্ত্তব্য নানারকম কর্ত্তব্যের মধ্যে একরকমের কর্ত্তব্য মাত্র।

এই ভেদ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের 'থিওরি' সংক্ষেপে এই ঃ— মানুষের যা সব কর্ত্তব্য, তার দুটো ভাগ। একভাগ বেদমূল, অন্যভাগ ন্যায়মূল। যে কর্ত্তব্যের মূল বেদ, তা' অন্য কোনও প্রমাণে জানা যায় না। বেদের বাক্যই তা' জানার একমাত্র উপায়। স্মৃতি বা সদাচার থেকে যে এ রকম কর্ত্তব্য জানা যায়, তারও মূল বেদ; কারণ স্মৃতির বচন থেকে বা সাধুদের আচার দেখে সেইরূপ বেদবাক্যের বা বিধির অনুমান করা যায়। কিন্তু মানুষের যে-সব কর্ত্তব্য প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণে জানা যায়, সে-সব কর্ত্তব্য বেদমূল নয়, ন্যায়-মূল। সেখানে বেদের প্রসার নেই, কারণ তারা বেদের বিষয়

নয়। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বল্‌ছেন ;—"ধর্ম্ম নামে মানুষের যে পুরুষার্থ অন্য কোনও প্রমাণ থেকে জানা যায় না, তাদের জানিয়ে দেয় ব'লেই বেদের নাম বেদ। এই ধর্ম্ম শ্রেয়ঃসাধন করে ব'লেই মানুষের কর্ত্তব্য, কিন্তু কেমন করে' যে সে শ্রেয়ঃ-সাধন করে, তা' প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় না। আরও সব কাজ আছে যা শ্রেয়ঃসাধন করে ব'লে মানুষের কর্ত্তব্য, যেমন কৃষি। কৃষি যে কেমন ক'রে মানুষের শ্রেয়ঃসাধন করে, তা' সাধারণ অন্বয়ব্যতিরেক প্রমাণেই (induction by agreement and difference) জানা যায়। এবং কেমন ক'রে কৃষিসাধন কর্‌লে যে ফসল পাওয়া যাবে, তা'ও প্রত্যক্ষ ও অনুমানেই জানা যায়। কিন্তু যাগযজ্ঞ কেমন ক'রে সাধন কর্‌তে হবে, এবং তার সাধনফলে পরকালে কি ক'রে যজমানের সুখ কি স্বর্গলাভ হবে, সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও লৌকিক জ্ঞানের প্রণালী দিয়েই পাওয়া যায় না। এ ধর্ম্ম কেবল জানা যায় বেদের ব্রাহ্মণ অংশের বিধিবাক্য থেকে, এবং ক্বচিৎ মন্ত্র অংশ থেকে (১)।"

(১) বিদন্ত্যনন্য প্রমাণবেদ্যং ধর্ম্মলক্ষণমর্থমস্মাদিতি বেদঃ।......যৎ পুরুষস্য কর্ত্তব্যং প্রত্যক্ষাদ্যবগম্য বিলক্ষণ স্বভাবেন। শ্রেয়ঃসাধনং কৃষিসেবাদি ভবতি পুরুষস্য কর্ত্তব্যত্বস্য চ তৎসাধনস্বভাবোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে। যাদৃশেন ব্যাপারেণ কৃষ্যাদের্ব্রীহ্যাদিসিদ্ধিঃ সাপি প্রত্যক্ষাদ্যবগম্যৈব। যাগাদেস্তু সাধনত্বং যেন চ রূপেণাপূর্ব্বোৎপত্তিব্যবধানাদিনা তন্ন প্রত্যক্ষাদ্যবগম্যম্।.............. অয়ং ধর্ম্মো ব্রাহ্মণবাক্যেভ্যোঽবগম্যতে লিঙাদিযুক্তেভ্যঃ, ক্বচিচ্চ মন্ত্রেভ্যোঽপি। (মেধাতিথি—মনুভাষ্য, ২।৬)

এই 'থিওরি' অনুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বলেছেন, রাজধর্ম্ম বা 'পলিটিক্স্' বেদমূল নয়, ন্যায়মূল (১)। আইন বা ব্যবহার-স্মৃতি, তা'ও বেদমূল নয়—ন্যায়মূল (২)। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা যদি অন্য কথা বলেন, এবং আমরা যদি সেই কথাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ব'লে চালাই, তার দায়ী প্রাচীন হিন্দু নয়।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের এই 'থিওরিতে' অনেক নবীন হিন্দু খুব সম্ভব বেজার হবেন। কারণ এ 'থিওরিতে' হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, এবং বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, এ দুয়েরই পথ বন্ধ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, যা অলৌকিক তা' লৌকিক যুক্তি ও বিচার দিয়ে বুঝ্‌বার চেষ্টা পণ্ডশ্রম; আর যা লৌকিক, তা' লৌকিক যুক্তি বিচারেই বুঝ্‌তে হবে, তার মধ্যে অলৌকিককে টেনে আনা মূর্খতা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হ'ল অলৌকিককে লৌকিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা; আর বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক ব্যাখা হ'ল লৌকিকের মধ্যে অলৌকিককে এনে ফেলা। হিন্দুধর্ম্মের কোনও অংশের যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের 'থিওরি' মতে সে অংশটা বেদমূল ধর্ম্ম অর্থাৎ 'রিলিজান' নয়, ন্যায়মূল

(১) প্রমাণান্তরমূলা হ্যত্র ধর্ম্মা উচ্যন্তে। ন সর্ব্বে বেদমূলাঃ। (মেধাতিথি—মনুভাষ্য, ৭।১)

(২) অন্যত্রাপি ব্যবহারস্মৃত্যাদৌ যত্র ন্যায়মূলতা তত্র যথাবসরং দর্শয়িষ্যামঃ। (মেধাতিথি, ২।৬)

লৌকিক কর্ত্তব্য মাত্র। তার ভালমন্দ যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে, কারণ শাস্ত্রবাক্যের সেখানে প্রসার নেই। অর্থাৎ প্রত্যূষে ফুলতোলা ও একাদশীতে উপবাস যদি স্বাস্থ্যের জন্য হয়, তবে তার ব্যবস্থা নিতে হবে ভট্‌চাযের কাছে নয়, কবিরাজের কাছে। এবং এতে যার স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, তার পক্ষে এ সব কর্ত্তব্য নয়; এ নিয়ে শাস্ত্রের বচন তুলে ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া বৃথা। আর যাগযজ্ঞে মানুষের মঙ্গল হয়, শাস্ত্রের বচনে যদি এতে বিশ্বাস জন্মে—ভাল কথা। যদি না হয় ত ফুরিয়ে গেল। লৌকিক যুক্তি তর্ক দিয়ে তা' আর প্রমাণ করা যাবে না।

যে মনোভাবের বশে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা অলৌকিককে লৌকিক থেকে একেবারে পৃথক ক'রে দেখেছিলেন, সে 'র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্‌' বা যুক্তিতন্ত্রতা প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের একটা প্রধান লক্ষণ। যা চোখ মেল্‌লে স্পষ্ট দেখা যায়, চোখ অর্দ্ধেক বুজে তাকে ঝাপ্‌সা ক'রে দেখা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যেটা যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্র, তাকে আধ্যাত্মিকতার মোহ, কি হৃদয়াবেগের কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখ্‌তে রাজি ছিলেন না; বুদ্ধির উজ্জ্বল সূর্য্যালোক সেখানে ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও তার টীকাকারদের লেখার প্রতি পাতায় এই 'র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্‌'-এর পরিচয় রয়েছে। যা বিচার ও যুক্তির ব্যাপার, সেখানে যুক্তি ও বিচার যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে পৌঁছতে তাঁদের বিন্দুমাত্র ভয় কি দ্বিধা ছিল না। বিচার-বিতর্ক আমরাও কিছু কম করিনে। কিন্তু তর্কে হেরে কে কবে

নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে প্রতিবাদীর ধর্ম্ম নিয়েছি, নিজের মতকে প্রকাশ্যে মিথ্যা স্বীকার ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্য হয়েছি? বরং এ কাজ যে করে, তাকে বলি কাণ্ডজ্ঞানহীন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর পণ্ডিতসমাজে এ ঘটনা যে নিত্য ঘট্‌ত, জনশ্রুতি তার সাক্ষী দিচ্ছে। প্রাচীন আর্য্যেরা যুক্তিকে কেবল মুখে নয়, জীবনে স্বীকার কর্‌তেন।

কিন্তু যুক্তিতন্ত্রতা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান কথা নয়। আর্য্য-মন যুক্তি-তন্ত্রী বলে' ধর্ম্মশাস্ত্রেও তার ছাপ লেগেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে গঠন ও শাসনের শাস্ত্র। এখানে যে মনোভাবের মুখ্য পরিচয়, সে হচ্ছে শিল্পী ও শাসকের, organiser ও administratorএর মনোভাব। ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের চোখের সামনে ব্যক্তি ও সমাজের একটি স্পষ্ট ও পূর্ণ আদর্শমূর্ত্তি ছিল। তাঁহাদের বিধি-ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজকে ঠিক সেই আদর্শের মত মূর্ত্তি দিয়ে গড়ে' তোলা। এবং এ কাজে তাঁদের সাহসের অন্ত ছিল না। মানুষের জীবনকে তাঁরা মনে কর্‌তেন শিল্পীর মূর্ত্তিগড়ার উপাদান। সহস্র বিধিনিষেধের অস্ত্রে কেটে যে একে মনের আদর্শমূর্ত্তির সঙ্গে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তা'তে তাঁদের সন্দেহ ছিল না। এবং ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের কোনও অংশ অনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ অগঠিত থাকবে, তাঁদের মন ছিল এ মনোভাবের বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে প্রাচীন আর্য্য-মন ছিল যাকে এখন আমরা বলি 'বুরোক্র্যাটিক' মন। ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের চেষ্টার ফলে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার হিত

হয়েছে বেশী, না অহিত হয়েছে বেশী, এ অবশ্য তর্কের কথা। মানুষের জীবনকে কতটা হাতে গড়ে' তোলা যায়, আর প্রাণবন্ত ব'লে কতটা ছাড়া রাখ্‌লে তবে সে নিজে গড়ে' ওঠে—এ বিচারের হয়ত কোনও চরম মীমাংসা নেই। বাঁধনের বাধায়, ক্লিষ্ট হ'য়ে একবার সে চাবে মুক্তি, আবার ছন্দহীন মুক্তিতে হাঁপিয়ে উঠে খুঁজ্‌বে নূতন বন্ধন। সে যাহোক্‌, জীবনের প্রাণপন্থা ও শিল্পপন্থার বিচারে প্রাচীন আর্য্যেরা ছিলেন শিল্প-পন্থী। যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ, তারা যে বিধিনিষেধের এত শাসন মান্‌বে না, ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের তা' অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন আচার্য্য গৌতম বলেছেন, "দৃষ্টো ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্‌", যাঁরা মহৎ তাঁদের সাহস আছে, তাঁরা ধর্ম্মবিধিকে অতিক্রম ক'রে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধি ও মনে যারা মধ্যবিৎ, বিধিনিষেধ অতিক্রম ক'রে চলার অধিকার তাদের দিতে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের সাহস ছিল না। প্রাচীন হিন্দুরা ব্যাকরণের জটিল বন্ধনে ভাষাকে বেঁধেছিলেন। ঋষিদের বাক্য এ জটিলতাকে মান্‌বে না, মহাকবিরা যে এ বন্ধন ছাড়িয়ে যাবেন, তা তাঁরা জান্‌তেন। কিন্তু যারা ঋষিও নয়, কবিও নয় তাদের স্বেচ্ছাচারকে তাঁরা অত্যাচার ব'লেই মনে কর্‌তেন।

কার্ত্তিক, ১৩৩২

চাষী

আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার ভিত খোঁড়া হয়েছে লাঙলের ফলায়। মানুষ যে আদিতে অসভ্য যাযাবর ছিল, তার কারণ স্থিতিশীল সভ্য হ'য়ে তার প্রাণে বাঁচ্‌বার উপায় ছিল না। অন্নের পশু ও পালিত পশুর অন্নের সন্ধানে তাকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিক্রম কর্‌তে হ'ত। পরিচিত ভূভাগ স্বল্পপশু ও তৃণবিরল হ'য়ে উঠ্‌লে, অজ্ঞাত দেশের দিকে পা বাড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা চল্‌ত না। কৃষির রহস্য আয়ত্ত ক'রে তবেই মানুষ এ ভবঘুরে অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। চাষের ক্ষেতকে কেন্দ্র ক'রে তারই চারপাশে গ্রাম, নগর, স্বদেশ, স্বরাজ্য গড়ে' উঠেছে। এই সব স্থায়ী আবাসে চাষের অন্নের কৃপায় মানুষের মন, শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, ভাব ও জ্ঞানের বিচিত্র সৃষ্টিতে রত হয়েছে। তার কর্ম্মকুশলতা অজস্রধারায় সহস্র পথ কেটে চলেছে। এই সভ্যতার জন্মের সন তারিখ ঠিক জানা নেই। কিন্তু মানুষ যেদিন চাষের ক্ষেতের কারখানায় হাবা-পৃথিবী থেকে অন্ন চুঁইয়ে নেবার সজীব কলের সৃষ্টিকৌশল আবিষ্কার করেছে সেই দিনই এর জন্মদিন।

মাটির চাষ সভ্যতাকে বহন ক'রে এনেছে, কিন্তু সে সভ্যতা চাষীকে বহন কর্‌তে পারে নি। চাষী চিরদিনই সভ্যতার

ভারবাহী মাত্র হ'য়ে আছে। সে হচ্ছে সভ্যতার মূল। মাটির নীচে থেকে রস টেনে সে সভ্যতার ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে,—কিন্তু তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ সে কখনও জান্‌বে না।

এর কারণ সভ্যতার জন্মকথার সঙ্গেই জড়ান রয়েছে। মানুষের যাযাবর জীবন ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য। জমিয়ে জমিয়ে অবাধে বাড়িয়ে তোলা যায়—ধনের এমন আকার ছিল না ব'লে, ধনী ও নির্ধনের উৎকট প্রভেদ তখন সম্ভব ছিল না। সমাজের এক ভাগ অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলের মোটা অংশ ভোগ কর্‌বে, এ ব্যবস্থার উপায় ও অবসর অতি সামান্য ছিল, এ জন্য সমাজের মধ্যে দাস-প্রভু সম্বন্ধ গড়ে' উঠ্‌তে পারে নি। বহিঃপ্রকৃতির দাসত্ব সকলকেই এমন নিরবচ্ছিন্ন কর্‌তে হ'ত যে, সে দাসের দলের এক ভাগের আর প্রভু হ'য়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। চাষের জ্ঞানের ফলে মানুষ সে-স্বর্গরাজ্য থেকে চ্যুত হয়েছে। মাটি যেদিন ধন হয়েছে, ও-স্বর্গরাজ্যও সেইদিন মাটি হয়েছে। চাষের ফসলকে জীবনোপায় করার সঙ্গে সেই কৌশল মানুষের করায়ত্ত হয়েছে, যাতে একজন বহুজনকে অনাহারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য ক'রে খাটিয়ে নিতে পারে। আর তার ফল ক্রমে জমা ক'রে সে ক্ষমতাকে ক্রমে বাড়িয়ে চল্‌তে পারে। যারা বলী ও কৌশলী, এ চেষ্টায় তাদের প্রলোভনও ছিল প্রচুর। যাযাবর জীবনে যারা অভ্যস্ত, চাষের পরিশ্রম তাদের কাছে বিস্বাদ ও অতিমাত্রায় ক্লেশকর। ক্ষুধার তাড়নায় গুরু শ্রম, আর তার শান্তিতে অখণ্ড আলস্য,—এই

ছিল যাযাবর জীবনযাত্রার সাধারণ ধারা। এর তুলনায় চাষীর শ্রম কঠোরতায় লঘু, কিন্তু সে শ্রম প্রতিদিনের নিয়মিত পরিশ্রম,—অনভ্যস্তের কাছে যা সব চেয়ে পীড়াকর। সে পরিশ্রম করতে হয় বর্ত্তমানের ক্ষুধার তাড়নায় নয়, ভবিষ্যতের অনাহারের আশঙ্কায়। কারণ সে পরিশ্রমে বর্ত্তমানের ক্ষুধা-নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে, এই চিরফলপ্রসূ, নিয়ত পরিশ্রমের গুরুভার বলবান ও বুদ্ধিমান লোকেরা চিরদিনই দুর্ব্বল ও হীনবুদ্ধিদের কাঁধেই চাপিয়ে এসেছে।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে এর উদাহরণ ছড়ান রয়েছে। সভ্য গ্রীসের রাজ্যগুলিতে চাষী ছিল ক্রীতদাস; আর এ ব্যবস্থা ভিন্ন সভ্যতা কি ক'রে টিঁকে থাকতে পারে, গ্রীক পণ্ডিতেরা তা' ভেবে পান নি। রোমান্ সভ্যতা সাম্রাজ্যের পথে পা দিতেই হাতের লাঙল তুলে দিয়েছিল দাসদের হাতে। ইউরোপের মধ্যযুগে ও রুষিয়াতে সেদিন পর্য্যন্ত চাষী ছিল নামে ও কাজে দাসেরই রূপান্তর। হিন্দুর শাস্ত্রে চাষের কাজ বৈশ্যের, অর্থাৎ আর্য্যের—যার বেদে অর্থাৎ বিদ্যায় অধিকার আছে। শাস্ত্রের কথা শাস্ত্রের পুঁথিতেই লেখা আছে, কিন্তু সুদূর অতীত থেকে চাষের লাঙল ঠেলছে শূদ্রে, যে শূদ্রকে "দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবা"—স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্ত্তা দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

মোট কথা, ধনতন্ত্রের যেমন দুই দিক—ধনসৃষ্টি ও ধনবিভাগ;

সভ্যতারও তেমনি দুই দিক—সৃষ্টি ও বিভাগ। শরীর ও মনের যা পুষ্টি ও সম্পদ, তার সৃষ্টির কাজে নানা সভ্যতার মধ্যে বড় ছোট, ভালমন্দ ভেদ আছে; কিন্তু বিভাগের কাজে সব সভ্যতার এক চাল। সভ্যতার সৃষ্টির বড় ও শ্রেষ্ঠ অংশ ভাগ হয় অল্প ক'জনার মধ্যে, যা অবশিষ্ট তাই থাকে বাকী সকলের জন্যে,—যদিও শ্রমের ভাগটা তাদেরই বেশী।

যে সভ্যতা নিজেকে আধুনিক ব'লে গর্ব্ব করে, তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান দাবী এই যে, বিভাগের এই উৎকট বৈষম্য সে ক্রমে কমিয়ে আন্‌ছে। জ্ঞান ও রসের সৃষ্টিকে অল্প ক'জনার জন্যে তুলে না রেখে', যার শক্তি আছে তারই আয়ত্তের মধ্যে এনে দেবার সে নানা পথ কেটে দিচ্ছে। শরীরের জন্য যে বস্তুসম্ভার, তাকে ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান এবং স্বল্পভাগ্য ও সাধারণবুদ্ধি লোকের মধ্যে কেবল প্রয়োজনের মাপে বেঁটে দেওয়া সম্ভব না হ'লেও, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা' থেকে যাতে কেউ না বঞ্চিত হয়,—সেদিকে তার চেষ্টার বিরাম নেই; এবং সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শকেও সে ক্রমে উঁচু দিকেই টেনে তুল্‌ছে। পূর্ব্বে যা' ধনীর বিলাস ছিল, তাকে সে অল্পবিত্তের নিত্য ব্যবহার্য্য করেছে। তার জন্যে ধনীর ব্যসনের আয়োজন ও পরিমাণ কমাতে হয় নি, তা' বরং বেড়েই চলেছে। তবুও যে এ কাজ সম্ভব হয়েছে, সে হচ্ছে বস্তুসৃষ্টির যে অভিনব কৌশল সে আবিষ্কার করেছে, তারই প্রয়োগে। এই কৌশলের বলে স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে, অল্প লোকে,

অতি সামান্য সময়ে প্রয়োজন ও বিলাসের যে বৃহৎ সামগ্রীসম্ভার উৎপন্ন কর্‌তে পারে, ইতিপূর্ব্বে সমস্ত দেশব্যাপী লোকের বহুদিনের চেষ্টাতেও তা' সম্ভব ছিল না। এই কৌশলের নাম 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্‌ম্‌'।

আধুনিক 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যাল' সভ্যতার এই দাবী, তার জন্ম ও লীলাভূমি পশ্চিম ইউরোপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ্‌লে সত্য ব'লেই স্বীকার কর্‌তে হবে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এখনও যতই পার্থক্য থাকুক, ধনিকের তুলনায় শ্রমিকের প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণের যোগান যতই নগণ্য হোক, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের তুলনায় 'ইন্‌ডাষ্ট্রীয়্যাল' যুগের সভ্যতার ভারবাহীরা অনেক বেশী পরিমাণে সে-সভ্যতার ফলভোগী হয়েছে। এ সভ্যতার যারা মাথায় রয়েছে, এ যে তাদের উদারতায় ঘটেছে তা' নয়। যারা ধনে ও বুদ্ধিতে প্রবল, তারা নিজেদের লাভের লোভেই 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্‌ম্‌'-এর গোড়াপত্তন করেছে। কিন্তু তার ফলে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে' উঠেছে তাতে ভারবাহীদের দল বাঁধ্‌বার সুযোগ ঘটেছে, এবং দলের চাপেই তারা ও-ফল আদায় করেছে। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর সম্ভাবনা ছিল ব'লেই এটা সম্ভব হয়েছে। নূতন সৃষ্টিকৌশলে যোগানের পরিমাণ যদি না বেড়ে যেত, তবে ধনিকের ভাণ্ডার খালি না করে' শ্রমিকের থলি ভরান কিছুতেই চল্‌ত না।

কিন্তু 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যাল' দেশগুলিতে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে গোটা

চাষী

পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, চাষীকে নিয়ে প্রাক্-'ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল' সভ্যতার যা সমস্যা, 'ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্' তার কোনই সমাধান কর্‌তে পারে নি; সমস্যাটিকে এক পা দূরে হটিয়ে রেখেছে মাত্র। পূর্ব্ব যুগের সভ্যতা যে গোঁজামিল দিয়ে এর মীমাংসার চেষ্টা করত, 'ইন্ডাষ্ট্রিয়াল'-সভ্যতা খুব ব্যাপকভাবে সেই গোঁজামিলই চালাতে চাচ্ছে।

সভ্যতার নিত্য সমস্যা হচ্ছে, জীবনের পুষ্টি ও আনন্দের যা উপকরণ আবিষ্কার হয়েছে, কি ক'রে তা' যথেষ্ট উৎপন্ন ক'রে সমাজের মধ্যে এমন ক'রে বেঁটে দেওয়া যায়, যাতে প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে কেউ বাদ না পড়ে, অথচ উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগের আকর্ষণেরও অভাব না হয়; আর প্রকৃতি যাদের নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে জন্ম দিয়েছে, তাদের সেই শক্তিপ্রয়োগের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের কি ক'রে ব্যবস্থা করা যায়। এর একটির উপর নির্ভর করে সভ্যতার স্থিতি, অন্যটির উপর তার বৃদ্ধি। এ পর্য্যন্ত কোনও সভ্যতা এ সমস্যার সমাধান কর্‌তে পারে নি। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সব সভ্যতা তার বোঝা চাপিয়েছে সমাজের একটা অংশের উপর, যাতে বাকী অংশটা ঐ পরিশ্রম থেকে মুক্ত হ'য়ে সভ্যতার ভোগ ও বৃদ্ধির যথেষ্ট উপকরণ ও অবসর পায়। সব সভ্যতার অন্তরেই এই ভয় যে, ঐ পরিশ্রমের ভার সমাজের এক অংশের মাথা থেকে লাঘবের জন্য সকলের উপর ভাগ ক'রে দিলে,

সভ্যতা সমাজের সকলের পক্ষেই বোঝা হ'য়ে উঠ্‌বে। ওর ভোগের উপাদান কারও ভাগ্যে জুট্‌বে না, ওর বৃদ্ধির সুযোগ ও অবসর কারও ঘট্‌বে না। কাজেই সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য বলে হোক, ছেলে হোক, সমাজের একদল লোককে তার ভারবাহী কর্‌তেই হবে, এবং খুব. সম্ভব সে-দল লোক হবে সংখ্যায় সব চেয়ে বড় দল।

'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যাল'-যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক সভ্যসমাজে সভ্যতার এই ভারবাহীর দল ছিল চাষী। কারণ কৃষিই ছিল প্রতি সমাজের জীবিকার মূল উৎস। 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্‌ম্' হঠাৎ আবিষ্কার কর্‌ল যে, কৃষিকে বাদ দিয়ে এক নূতন ধরণের কারুশিল্পে সমাজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগ কর্‌লে তার ফল ফলে বেশী। কৃষি জীবিকার যে উপকরণ উৎপন্ন করে, সমান পরিশ্রমে এতে তার অনেক গুণ বেশী পাওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপে এই ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে দেখা গেল যে, এই সমাজব্যবস্থায় সভ্যতার ভারবাহীদেরও অনেক পরিমাণে তার ফলভোগী করা কৃষিসভ্যতার তুলনায় সহজসাধ্য। কারণ এতে যে অল্প সময়ের পরিশ্রমে অনেক বেশী ফল লাভ হয় কেবল তাই নয়, এ ব্যবস্থায় কৃষির জন্য দেশের অধিকাংশ লোককে দেশময় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে থাক্‌তে হয় না, স্থানে স্থানে অল্প জায়গার মধ্যে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হয়। অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী না থেকে নগরবাসী হয়; এবং গ্রাম্য হ'ল সভ্যতার বোঝাবাহী বর্ব্বর, আর নাগরিক তার ফলভোগী

বিদগ্ধজন। সহরের দলবদ্ধ লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য যা' সহজসাধ্য, সারা দেশে ছড়ান চাষীর জন্য সে ব্যবস্থা অতি দুঃসাধ্য।

'ইন্ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্ম্'এর এই পরিণতিতে ইউরোপের অনেক সমাজহিতৈষী ভাবুক স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়েছেন। তাঁরা বল্ছেন এখন যদি ধনীর লাভের লোভ ও বিলাসের দাবী কমান যায়, এবং কাউকেও অলস থেকে পরের পরিশ্রমের ফলভোগ কর্‌তে না দিয়ে পরিশ্রমের ভার সকলের মধ্যে ভাগ করা যায়, তবে প্রত্যেক লোকের প্রতিদিন অল্প সময়ের পরিশ্রমেই সমাজের সকলের প্রয়োজন ও অল্পস্বল্প বিলাসের উপযোগী ধন উৎপন্ন হ'তে পারে। আর সভ্যতার যা' শ্রেষ্ঠ ফল, সৃষ্টি-কৌশলীদের তার সৃষ্টির এবং অন্য সকলের তার রসগ্রহণের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের ব্যবস্থা হয়। সভ্যতার ভারবাহী হতভাগ্যের দল সমাজ থেকে লোপ পায়।

বিনা আগুনে এই অন্নপাক কি ক'রে সম্ভব হবে? উত্তর অতি সহজ,—পরের আগুনের উপর পাকপাত্র চাপিয়ে। ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল-সমাজ চায় কৃষির পরিশ্রম ও তার আনুষঙ্গিক সমাজব্যবস্থার অসুবিধা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। অথচ ইন্ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্মের আদি ও অন্ত চাষীর পরিশ্রমের উপর নির্ভর কর্‌ছে। তার শিল্পের উপাদানও যোগাবে কৃষি, বিনিময়ও যোগাবে কৃষি। সুতরাং 'ইন্ডাষ্ট্রীয়্যাল' সমাজ থেকে কৃষির পরিশ্রম দূর করার অর্থ—অন্য সমাজের উপর সেই পরিশ্রম

দ্বিগুণ ক'রে চাপান, প্রতি সমাজে চাষীর যে সমস্যা ছিল, কতকগুলি সমাজ থেকে তা' সরিয়ে অন্য কতকগুলি সমাজের ঘাড়ে তুলে দেওয়া; পৃথিবীর প্রতি সভ্যদেশের একদল লোককে তার সভ্যতার ভারবাহী না ক'রে, কতকগুলি সভ্যদেশের সভ্যতার ভার অন্য কতকগুলি দেশকে দিয়ে বহন করান'; যে ছল ও বল প্রত্যেক সভ্যসমাজের এক ভাগ লোক অন্য ভাগের উপর প্রয়োগ করত, সেই ছল ও বল আত্মীয়তার বাধা নিরপেক্ষ হ'য়ে মনুষ্যসমাজের একভাগের উপর প্রয়োগ করা।

যাযাবর মানুষের সঙ্গে স্থিতিশীল কৃষিসভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায় জুড়ে' রয়েছে। এই সংঘর্ষেই রোমান্ সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, বোগদাদের মুসলিম সভ্যতার বিলোপ ঘটেছে। 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্‌ম্' সেই সংঘর্ষেরই আর এক মূর্তি। চাষের পরিশ্রম অস্বীকার ক'রে এও চাষীর পরিশ্রমের ফল লুট্‌তে চায়। যে ধন ও ধনী একে চালনা করছে, তারাও মুখ্যত যাযাবর। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, পৃথিবীর এক ভাগ থেকে অন্য ভাগে প্রয়োজনমত চ'লে বেড়াতে তাদের কিছুতেই বাধা নেই। এবং এর হাতে বিনিময়ের বাটখাড়া থাক্‌লেও, অন্য হাতে যাযাবরের শাণিত অস্ত্র বাহাল রয়েছে।

সভ্যতার যা' সমস্যা, 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্‌ম্' তার মীমাংসা নয়; কারণ ও-ব্যবস্থা মানুষের সমাজকে এক ক'রে দেখে না এবং দেখতে পারে না। মানুষের এক অংশকে ভারবাহীতে পরিণত

না ক'রে, সভ্যতাকে কেমন ক'রে বাঁচান ও বাড়ান যায়, সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ থেকে 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্‌মের' এর কোনও উত্তর নেই। মানুষের সভ্যতার চরম সমস্যা হচ্ছে চাষী। যেদিন চাষীকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে' ফলভোগী করা সম্ভব হবে, কেবল সেইদিন সভ্যতার সমস্যার যথার্থ মীমাংসা হবে। যদি তা' সম্ভব না হয়, তবে প্রমাণ হবে গ্রীকপাণ্ডিত্যের কথাই সত্য,—দাসের শ্রম ভিন্ন সভ্যতার চাকা অচল।

ফাল্গুন, ১৩৩২

ভারতবর্ষ

হালের ভারতবর্ষ নিয়ে আমাদের ইংরেজ সরকারের যে মুস্কিল হয়েছে তার বিশগুণ বিপদে পড়েছি আমরা ভারতবাসীরা প্রাচীন ভারতবর্ষকে নিয়ে।

বর্ত্তমান যাহোক অনেকটা চোখের সাম্‌নে রয়েছে। ওর ভিতরে কি আছে না আছে আশঙ্কা হ'লে সঙ্গীন দিয়ে খুচিয়ে দেখা যায়; ওর ধড়্‌ফড়ানি লাঠি পিটে ঠাণ্ডা করা চলে; ওর মুখরতার মুখ বন্ধের জন্য মোয়া লাড্ডু, রাহা খরচ আছে। কিন্তু অতীতকে নিয়ে কি করা যায়। ওকে না যায় চোখে দেখা, না চলে চেপে ধরা। অথচ অবস্থার গতিকে এমনি দাঁড়িয়েছে যে, আজকার দিনে ভারতবর্ষের অতীত ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফিরাতে গেলেই গালে চড় পড়ে; ওর বোঝার চাপে পিঠ বাঁকা হওয়ার নামই মুক্তি নয় এ বলার যো'টী নেই। কারণ আম্‌রা দশে মিলে ভোটে প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছি যে ভারতবর্ষের অতীতই তার বর্ত্তমানের পথের আলো; ও-আলো আমাদের পেছন থেকে সামনে ছায়া না ফেলে কেবল আলোই ছড়াচ্ছে। আর এতেও আমাদের সন্দেহ নেই যে ঐ অতীতকে পিঠে সোয়ার কর্ত্তে পার্‌লেই সে আমাদের সোজা গম্য অর্থাৎ কাম্য স্থানে পৌঁছে দেবে। জাতি যখন তার বর্ত্তমানের হীনতা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়,

পঙ্গুতা পরিহার ক'রে এগিয়ে চলার বল সংগ্রহ করে, তখন নিজের অতীত থেকে শক্তি লাভের চেষ্টা কিছু নূতন নয়। সামনে এগিয়ে চলাকে পিছনে ফিরে যাওয়া ব'লে কল্পনার মধ্যেও নূতনত্ব কিছু নেই। এ সব ঘটনা মানুষের ইতিহাসে নানা জাতির মধ্যে বার বার ঘটেছে। এর কারণ কোনও সভ্যতার গতিই একটানা নয়। দৌড়ে বসে জেগে ঘুমিয়ে, উঠে পড়ে এমনি ক'রেই সভ্যতা চল্‌ছে ও চল্‌বে। সেই জন্য কোনও আপাত-স্থবীর জাতির মধ্যে যখন নব-জীবনের স্পন্দন আসে এক অর্থে সেটা তার পুনর্জন্ম। তার অতীতের যে সব অংশে প্রাণের প্রাচুর্য্য ছিল তার সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। নব জাগ্রত জাতির চোখের সম্মুখে প্রাণে ভরপুর ভবিষ্যতের যে ছবি থাকে প্রাণহীন বর্ত্তমানের চেয়ে প্রাণবন্ত অতীতের সঙ্গে তার মিল ঢের বেশী। এই জন্য ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে মনে হয় অতীতের দিকে ফিরে চলা। কিন্তু মুখে যাই বলুক, জাতির অন্তরাত্মা যা' চায় তা' অতীতকে মগ্ন কর্‌তে নয়, নিজের প্রাণে অতীতের প্রাণের সেই স্পর্শ পেতে' যার বেগে অতীত তার বর্ত্তমানকে ছাড়িয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

আজকে আমরা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা পূরণে যে তার অতীতকে ডাক দিচ্ছি, তারও নিশ্চয় এই অর্থ। আমরা ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের সেই সব যুগের সঙ্গে মনের যোগ ঘটাতে চাচ্ছি যার প্রাণের বেগ ও গতি আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টা ও ভবিষ্যৎ আদর্শের অনুকূল ও অনুরূপ। না হ'লে কোন

জাতিরই সমস্ত অতীতটা তার গৌরবের নয়; ভারতবর্ষেরও নয়। সুতরাং এ প্রশ্নটা উঠে পড়ে, আমাদের এই বাঞ্ছিত অতীত ভারতবর্ষের বিচিত্র ও দীর্ঘ ইতিহাসের কোন্ অতীত? ভারতবর্ষের প্রাণ মনের বিকাশের কোন্ ছবিটা বর্ত্তমানে আমাদের চোখের সামনে রাখা সব চেয়ে দরকারী। সকলেই জানে এর এক কথায় উত্তর 'আধ্যাত্মিকতা'। আর এ উত্তরের সুবিধা এই যে সংক্ষিপ্ত হ'লেও ওর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ উত্তর যাঁরা দেন তাঁরা বলেন ও বস্তু অনুভূতিগম্য, কথায় বোঝান'র জিনিষ নয়। ওর স্বরূপ অবাচ্য; কেবল ও কি নয় তাই কতকটা নেতি নেতি ক'রে বলা যায়। এবং তা' বলতে গেলে যা' দাঁড়ায় সে হচ্ছে ও পদার্থ সমাজতত্ত্ব নয়, রাজনীতি নয়, অর্থনীতি নয়; ধর্ম্ম-ব্যবহার, শিল্পকলা নয়; কাব্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন—কিছু নয়। অর্থাৎ মানুষের প্রাচীন ও নবীন আর সমস্ত সভ্যতা যা' গৌরবের জিনিষ ব'লে জানে তার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। আর ঐ বস্তু হ'ল ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বিশিষ্টতা, যাকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই আমাদের সমস্ত দুঃখ-দীনতার অবসান হবে। সোজা কথায় ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ছিল একটা সৃষ্টিছাড়া জিনিষ, যার সঙ্গে বাকী পৃথিবীর কোনও যোগ ছিল না। বর্ত্তমানে আমাদের হ'তে হবে কিম্ভূতকিমাকার জাতি, যার সাথে আর কারু কোনও মিল থাকবে না।

মন বেজার হ'লেও সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে,

প্রাচীন ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মিক সভ্যতার ছবি আমরা আঁকি নি। এঁকেছে এক দল ইউরোপীয় পণ্ডিত, যাদের বলে 'ওরিয়েণ্টালিষ্ট'—প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্। এদেরি ক'জন মিলে এই উপন্যাসটী রচনা করেছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা একটা অদ্ভুত জিনিষ ছিল। অন্য সব সভ্যতার সঙ্গে তার মিলের চেয়ে গরমিল বেশী। আর আর সভ্যতা বাস করে ইহলোকে, ও-সভ্যতা বাস করে পরলোকে; আর সবাই চায় জীবন, ও চাইত মৃত্যু; আর সবার চোখ ছিল চেয়ে দেখ্‌বার জন্য, ওর ছিল বুজে ধ্যান কর্‌বার জন্য। এই উপন্যাসটী মুখস্থ ক'রেই আমরা জোর গলায় প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার বক্তৃতা উদ্গীরণ কর্‌ছি। এর এক প্রধান কারণ আমাদের বর্ত্তমান প্রভুদের উপর অভিমান। তাঁরা নাকি আমাদের বুটের তলায় চেপে রেখেছেন, তাই আমরা সেখান থেকেই বলছি, "আছি বটে নীচে পড়ে কিন্তু তোমরা বুঝবে না আমাদের বাস কত উঁচুতে। তোমরা যা' সবের গৌরব কর ও-সব ত কিছুই নয়। আমাদের প্রাচীন পিতামহেরা ও-সবকে সভ্যতার উপকরণ ব'লেই গণনা কর্‌তেন না। তাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিক; আমরাও তাঁদেরি বংশধর।" নইলে এ সব কথা বোঝা শক্ত যে, যে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস হ'ল মহাভারত, ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল মনুসংহিতা, যার অর্থ-শাস্ত্রের আচার্য্য কৌটিল্য, যার মোক্ষশাস্ত্র ছিল গৃহীর অপাঠ্য, আর বাৎস্যায়নও যার ঋষি, তার ছবি আমরা আধ্যাত্মিকতার একরঙা তুলিতে কেমন ক'রে এঁকে তুলি। তবে এ কথাও

ঠিক, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বক্তৃতা দিতে তার যা' সব নিদর্শন আছে তার সঙ্গে পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই ; মনের খুসিতে কল্পনা ক'রে নিলেই হ'ল। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন, বাল্মীকির রামায়ণের উপর তাঁর অগাধ ভক্তি তিনি সব সময়ে প্রচার করতেন। কথাপ্রসঙ্গে সন্দেহ হ'ল ও-বই তিনি কখনও চোখে দেখেন নি। জিজ্ঞাসায় বল্‌লেন, বাল্মীকির রামায়ণ মূলে কি অনুবাদে তিনি কখনও পড়েন নি বটে কিন্তু তুলসীদাসের রামায়ণের ইংরাজি অনুবাদ অনেকটা পড়েছেন। এক দিন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড থেকে বর্ষায় রামের বিরহ বর্ণনা তাঁকে পড়ে শোনালে দেখ্‌লেম তিনি বড় মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্ত্রীর জন্য ও-রকম বিলাপ একালের কলেজের ছেলেদেরই ফ্যাসান ; কিন্তু রামচন্দ্রের পক্ষে—স্পষ্ট বুঝ্‌লুম রামায়ণের রামসীতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর মনে কল্পনার যে ছবি ছিল রামায়ণ বইটা তাতে একটা জবর ঘা দিল।

কিন্তু আজ যখন আমরা কল্পনার জাল বোনা ছেড়ে জীবনের জাল নিয়ে বসেছি তখন এ কথা জোর ক'রে স্পষ্ট ক'রে বলার সময় হয়েছে, কি ভারতবর্ষের অতীত, কি তার বর্ত্তমান কিছুই পৃথিবী-ছাড়া সৃষ্টিছাড়া নয়। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিশিষ্টতা অবশ্যই ছিল, কারণ দুটো সভ্যতা দূরে থাকুক, এক গাছের দুটো পাতাও ঠিক একরকম নয়। ঠিক একই ছাঁচের বহু জিনিষ বের হয় কল থেকে, জীবন থেকে নয় ; কিন্তু এই বিশিষ্টতার যা' ভিত্তি তা' মানব-সভ্যতার সাধারণ ভিত্তি।

ইমারতের গড়ন আলাদা কিন্তু তার মাল-মসলা একই। প্রাচীন পৃথিবীর যেগুলি শ্রেষ্ঠ সভ্যতা, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে তাদের বৈষম্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশী। যেমন মানুষে মানুষে তফাতের চেয়ে মিলই বেশী। ইংরেজ টেবিল পেতে কাঁটা চাম্‌চে দিয়ে খায়, আমরা পাতা পেতে হাত দিয়ে খাই। এর মধ্যে তফাতের চেয়ে এই মিলই নিশ্চয়ই ঢের বেশী যে, শরীর ধারণের জন্য ইংরেজকেও খেতে হয়, ভারতবাসীকেও খেতে হয়। আজকার চিত্তবিভ্রমের দিনে এই সহজ কথা আমাদের মনে করা দরকার হ'য়েছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষেও রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ত, সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ক'র্‌ত, দুর্ভিক্ষে লোক মর্‌ত, কবিরা প্রেমের কবিতা লিখ্‌ত, উৎসবে মোহমুদ্গর পাঠ হ'ত না। এবং আমরা বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে সভ্যতা গড়ে' তুল্‌ব তারও বিশিষ্টতা থাক্‌বে সন্দেহ নেই। কিন্তু চার পাশের সভ্যতার সঙ্গে সে একটা খাপছাড়া কিছু হবে না। তারও রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবহার দরকার হবে। সে-ও হবে মানুষের সভ্যতার বিচিত্র লীলার একটা প্রকাশ। এ নাস্তিকতা মন থেকে দূর কর্‌তে হবে, যে, ভগবান সমস্ত পৃথিবীকে বঞ্চিত ক'রে শ্রেষ্ঠ যা' কিছু তা' ভারতবর্ষের উপরেই বর্ষণ কর্‌বেন।

এখন মনে হচ্ছে, এই যে তর্ক কর্‌ছি এও বিশিষ্টতার দাবী শুনে শুনে একটু বিভ্রান্ত হ'য়ে। ভাবটা প্রকাশ কর্‌ছি যেন এ দাবীর মধ্যে একটা বিশিষ্টতার কিছু আছে। কিন্তু ভেবে

দেখ্‌ছি ঐ বিশিষ্টতার দাবী সব সভ্যজাতিই করেছে। 'আমরা আর কারু মত নই' এ কথায় সবাই আর সবার মত ;—বিশেষ ক'রে যে-সব জাতি ঘা' খেয়ে পড়ে' আবার উঠতে যাচ্ছে। নেপোলিয়ানের মার খেয়ে প্রুশিয়া যখন শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা কর্‌ছিল, তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের কাছে দার্শনিক ফিক্তে ঠিক এই বক্তৃতাই দিয়েছিলেন। 'আমরা জার্ম্মান জাতি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মানুষের ভবিষ্যৎ আমাদের উপরেই নির্ভর কর্‌ছে। আমরা যে সভ্যতা গড়্‌ব সে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'।'

এতক্ষণ যা' বল্লুম তা' এই কল্পনা ক'রে যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর ভারতবর্ষ। অতীত থেকে যা' কিছু আলো চাই সে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার আলো। কিন্তু সবাই জানি এটা কেবলি কল্পনা। বর্ত্তমান ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর ভারতবর্ষ নয়। অন্তত পক্ষে হিন্দু মুসলমান এ দু'য়ের ভারতবর্ষ। এবং যে অতীত হিন্দুর গৌরবের তাতে মুসলমানের স্পর্শ নেই। আর যে অতীত মুসলমানের গৌরবের তা' ভারতবর্ষের অতীত নয়। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের গড়ে' তুল্‌তে হবে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। সন্দেহ মাত্র নেই, এই ব্যাপারে আমরা যেই খেলা ছেড়ে কাজে লাগব অমনি বর্ত্তমানের ঘসায় প্রাচীন গৌরবের খোঁচাগুলি পালিশ হ'য়ে যাবে। হিন্দুর যাবে, মুসলমানেরও যাবে। এবং বিধাতার কৃপায় আমাদের হয়ত সেই ভূমিতেই যেয়ে দাঁড়াতে হবে যেখানে মানুষের বিভিন্ন সভ্যতা গোঁড়ামী ছেড়ে নির্ব্বিরোধে মিশতে পারে।

তুতান্-খামেন

হাজার তিনেক বছর হ'ল মিশরের এই রাজাটি জীবন-যাত্রার চেয়ে বেশী আড়ম্বরে মরণ-যাত্রা করেছিলেন। খাবার-দাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ, গন্ধ-অলঙ্কার,—সেগুলি ভরে' নেবার নানা রকম সৌখীন বাক্স-পেটারা, খাট-পালঙ্ক, চৌকী-সিংহাসন, যান-বাহন, এমন কি বৈতরণীর খেয়া পারের নৌকো পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিল। তিন ঘর বোঝাই এই সব আসবাবপত্র এপার থেকে ওপারের পথ কতটা সুগম করেছিল জানার যো নেই, কিন্তু ও-গুলো যে মহারাজকে ওপার থেকে এপারে তিন হাজার বছরের ব্যবধান নিমেষে পার ক'রে এনেছে তাতে সন্দেহ নেই। মহারাজকে ত' এ seasonএ ইয়ুরোপের leader of fashion বল্‌লেই চলে। তাঁর পোষাকের cutএ লণ্ডনে জামা কাটা হচ্ছে, তাঁর কোমরবন্ধের কায়দায় প্যারীতে মেয়েদের কোমরবন্ধ তৈরী হচ্ছে। আশা করা যায়, কল্‌কাতার রাস্তায়ও 'তুতান্-খামেন চটিজুতা'র বিজ্ঞাপন শীঘ্রই দেখা যাবে।

মিশরের সভ্যতার প্রকাণ্ড দীর্ঘ ইতিহাসে তুতান্-খামেন খুব প্রাচীন রাজা নন। ঐতিহাসিক জ্ঞান বর্ত্তমানে যে রাজবংশে গিয়ে ঠেকেছে ব'লে তাকে বলা হয় প্রথম রাজবংশ, মিশরের সেই রাজবংশের রাজারা এখন থেকে প্রায় সাত হাজার বছর

আগেকার লোক—অর্থাৎ তাঁদের সময় থেকে তুতান্-খামেনের সময়ের ব্যবধান, তুতান্-খামেনের ও বর্ত্তমান কালের মধ্যের ব্যবধানের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। আর তুতান-খামেনের কবরে জিনিষপত্র, ছবি, মূর্ত্তি যা'-সব পাওয়া গেছে, বিস্ময়ের প্রথম চমক কেটে গেলে হয় ত প্রমাণ হবে, ওদের সোনার পালিশ আর মণি মাণিক্যের দ্যুতি ইতিহাসের অন্ধকারকে বড় বেশী আলো করেনি—মিশরের প্রাচীন সভ্যতার ও-রকম সব নিদর্শন বেশীর ভাগই ইতিপূর্ব্বেই আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এ সব নাস্তিকতার কথা আজ নয়। আজ 'জয় মহারাজ তুতান্-খামেনের জয়'। রয়টারের বিদ্যুৎ সবাইকে ধাক্কা দিয়ে জানাচ্ছে, মানুষের সভ্যতা কিছু সেদিনকার বস্তু নয়; ও-জিনিষটী প্রাচীন ও বুনীয়াদি। চেয়ে দেখ তিন হাজার বৎসর আগেকার মিশরের ঐশ্বর্য্য, শিল্প-কলা, বিলাস, ব্যসন। যা' নিতান্ত আধুনিক হালফ্যাসান ভেবেছিলে তাও গ্রীস জন্মাবার হাজার বছর আগে মানুষের সমাজে চল্‌তি ছিল।

কিন্তু কেবল কথায় খুসি না থেকে কাগজওয়ালাদের ছবি ছাপ্‌তে বল্‌লে কে? তাদের ছবিতে কি সোণার রং ওঠে, না মণি-জহরতের জ্যোতি ফোটে? ও-ছবিতে ত দেখ্‌ছি তুতান্-খামেনের পেটা-সোনার সিংহাসন আর তাঁর আবলুশ কাঠের বেড়াবার ছড়ি দুয়ের একই কালো কালির রং। তাঁর সোনার লতা-কাটা গজদন্তের আসনকে আমার সেগুন কাঠের চেয়ার-খানার জ্ঞাতি-ভাই ব'লেই মনে হচ্ছে। যাহোক্ এ সব আসবাব-

পত্রের ছবি তবুও ছিল এক রকম। কালির কালো আঁচড়কে শিল্পীর সোনালী রেখা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু তুতান্-খামেনের কবরে পাওয়া ছবি ও ভাস্কর্য্যের ফটোগুলো নির্ব্বিচারে কেন ছাপান? ঐ মহারাজ তুতান্-খামেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিজয়ী বীরের দৃপ্ত ভঙ্গীতে। বেশ; দেখে মন খুসি হ'ল। কিন্তু ঐ ওরা আবার কারা? ঐ যাদের ঘাড়ের বোঝার ভারে কোমর নুইয়ে প'ড়েছে। প্রাচীন মিশরের ঐশ্বর্য্যে ওদের অংশটা কি সে খবর ত রয়টার দেয় নি। দেশ বিদেশের দ্রব্যসম্ভার ওরা রাজ-প্রাসাদে ব'য়ে নিয়ে আস্‌ছে? বাঃ, তবে ত দেখ্‌ছি মানুষের সভ্যতার সবটাই সুপ্রাচীন। তুতান্-খামেনের রাজ-ঐশ্বর্য্যও প্রাচীন, আজকের রাজপথের কুলি-মুটেও সমান প্রাচীন। যারা তুতান্-খামেনের দিনে ঘাড়ে বোঝা বইত, আর যারা আজকের দিনে মাথায় মোট বয় তাদের মধ্যে ত কোনও তফাৎ নেই। সেই কটিতে কৌপীন, শরীরে ক্লান্তি, মনে দীনতা—সবই এক। মানুষের সভ্যতা দেখ্‌ছি 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের' শ্মশানের মত, 'ঈশা বল, মুশা বল, রামমোহন রায় বল, এমন সাম্য-সংস্থাপক জগতে আর নাই।' যেখানে ওর প্রকাশ সেখানেই ঐ এক মূর্ত্তি। বহু মানুষের নৈপুণ্যের সৃষ্টি, বহুলোকের পরিশ্রমের ফল ঐ দু-একজন ভোগ কর্‌ছে, অপব্যয় কর্‌ছে, নষ্ট কর্‌ছে, তুতান্-খামেনের মত নিজের মরা শরীরের সঙ্গে মাটির নীচে কবর দিচ্ছে। তিন হাজার বছর আগেও যা', তিন হাজার বছর পরেও তাই। মানুষের সভ্যতার গোমুখী

থেকে আজ পর্য্যন্ত ঐ একই ধারা চলে' এসেছে। কোনও ভগীরথের শঙ্খ ওকে নূতন খাদে বহাতে পার্‌বে, না ঐ খাদ দিয়ে চলেই ওকে মহাসাগরে বিলীন হ'তে হবে, তা' মানুষেও জানে না, দেবতাও জানে না।

কান দিয়ে মন যে নেশা করেছিল তা' চোখ দিয়ে ছুটে গেল—কাগজ-ওয়ালাদের ছবির দোষে। তুতান্‌-খামেনের কবরের খবরে প্রাচীন মিশরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা শুনে ভেবেছিলাম যাহোক, বাংলার বাইরেও একদিন একটা সোনার বাংলা ছিল; সেখানে সকলেরই গোলাভরা ধান, অর্থাৎ যব, গম, গোয়ালভরা গরু, মুখভরা হাসি। কিন্তু তুতান্‌-খামেনের ছবির কালি দেখ্‌ছি দুই সমুদ্র তিন নদী পার হ'য়ে সোনার বাংলার সোনাতেও এসে লাগ্‌ল। 'বাংলা ছিল সোনার বাংলা' তা' ত বটেই। কিন্তু কবে ছিল? কল-কারখানা, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় আসবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি? সেই সময়েই ত ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর। তাতে নাকি সোনার বাংলার এক পোয়া লোকের উপর না খেয়ে মরেছিল! মোগল পাঠানের আমলে বোধ হয়? বিদেশীদের বর্ণনা, আবুল ফজলের গেজেটিয়ার, মুকুন্দরামের কবিতা রয়েছে। গোলায় ধান, গোয়ালে গরু অবশ্যই ছিল—এখনও আছে। কিন্তু এখনকার মত তখনও সে গোলা আর গোয়ালের মালিক অল্প কজনাই ছিল। সোনার বাংলার অনেক সোনার ছেলে তখন চটের কাপড় পর্‌ত এমনও আভাস আছে। তবে হিন্দুযুগে নিশ্চয়। কিন্তু সে যুগেও কি এখনকার মত

দেশে শূদ্রই ছিল বেশী? তাদের Standard of living ত মনু বেঁধে দিয়েছেন—

"উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥"

ঋষি গৌতমেরও ঐ ব্যবস্থা:—"জীর্ণান্যুপানচ্ছত্রবাসঃ—কূর্চ্চাণ্যুচ্ছিষ্টাশনং"। পুরনো জুতো, ভাঙ্গা ছাতা, জীর্ণ কাপড় তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, ছেঁড়া মাদুর তাদের আসন, উচ্ছিষ্ট অন্ন তাদের আহার। 'পুলাক' কথাটার অর্থ ধানের আগড়া; টীকাকারদের ভাষায় 'অসার ধান'। দেশে গোলাভরা ধান থাক্‌লেও দেশবাসীর বেশীর ভাগের কপালে কেবল ক্ষুদকুঁড়ো জুট্‌তে কোনও আটক নেই।

যাক্‌, এ সব 'আন্‌পেট্রিয়টিক্‌' খবর চাপা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু মহারাজ তুতান্‌-খামেন একটা বিষয়ে বড় নিরাশ করেছেন। তাঁর নাড়ী-ভুঁড়ির চার পাশে বাক্স সিন্ধুক যা' সব সাজিয়েছিলেন তাতে যদি কেবল কাপড়-চোপড় টুকি-টাকি বোঝাই না দিয়ে তাঁর 'পেপিরাসের' লাইব্রেরীটাও পূরে' নিতেন তা' হ'লে long journeyতে তাঁরও bored হবার ভয় থাকৃত না, আমরাও চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌তেম। তুতান্‌-খামেনের দিনে মিশরের কবিরা 'নীল' নদের জোয়ার-ভাঁটার যে গান গেয়েছিল, নদী-তীরের কুটীরবাসীদের সুখ, দুঃখ, প্রণয়, বিরোধের যে কাহিনী রচেছিল, সে-যুগের জ্ঞানীরা জীবন-মৃত্যুর রহস্য কোন্‌ চাবী দিয়ে খুল্‌তে চেয়েছিলেন, তার

পণ্ডিতদের চোখে পৃথিবীর চেহারা কেমনতর ছিল, মহারাজ যদি আমাদের এগুলি জানাবার ব্যবস্থা কর্‌তেন তবে তাঁর তিন হাজার বছরের মরা যুগ আজকের দিনে সজীব হ'য়ে উঠ্‌ত—তারের খবরে নয়, দরদী লোকের মনে। আমরা মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব কর্‌তেম—সেই তিন হাজার বছর আগেকার মানুষ ঠিক আমাদেরই মত মানুষ। খবর এসেছে, সমাধির ঘরে গোটা কয়েক 'পেপিরাস'-এর গোলাও পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে যে মহারাজের বীর্য্য ও বিজয়ের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছু আছে এমন ভরসা নেই। সুতরাং মনের আপশোষ মনেই থেকে যাবে।

এক বন্ধু খবর দিলেন, লুক্সরে যে কবর আবিষ্কার হ'য়েছে তা' তুতান্‌-খামেন-ফামেন কারু নয়। মিশরতত্ত্বজ্ঞ ফরাশী পণ্ডিতরা নাকি বলেছেন ওটা একটা ডাকাতের আড্ডা, 'bandit's den'—রাজ-রাজড়াদের কবর লুটে', লুটের মাল ডাকাতরা একটা সুবিধামত কবরে লুকিয়ে রেখেছে। এবং ও-রকম সব 'ডেন্‌' নাকি এর পূর্ব্বেও আরো আবিষ্কার হ'য়েছে। ফরাসী পণ্ডিতদের এ চালাকী চল্‌ছে না। আমরা সবাই বুঝেছি তাঁদের এ সব কথা কেবল হিংসা ও ঈর্ষ্যার কথা। বৃটিশ আর আমেরিকান মিলে এই আবিষ্কারটি ক'রেছে, আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজা 'তোদন ক্ষম' নাম ভাঁড়িয়ে হ'য়েছিলেন 'তুতান্‌-খামেন' এটা প্রমাণ হয়-হয় হ'য়েছে, এই শুনেই তাঁরা এ-সব সন্দেহ রটাচ্ছেন।

ইংরেজ-বাঙ্গালী কো-অপারেট ক'রে হয় কালীঘাটে, নয় ড্যাল্‌-হৌসি ইন্‌ষ্টিটিউটে এখনি প্রতিবাদ সভা ডাকা উচিত।

বৈশাখ, ১৩৩০

গণেশ

সর্ব্ববিঘ্নহর ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ব'লে যে দেবতাটি হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে সর্ব্বাগ্রে পূজা পান, তাঁর 'গণেশ' নামেই পরিচয় যে তিনি 'গণ' অর্থাৎ জনসঙ্ঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা জনসঙ্ঘের উপর অশেষ ভক্তি ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি কর্‌তেন না, ভয় কর্‌তেন! 'গণেশ' দেবতাটির আদিম পরিকল্পনায় এর বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আদিতে 'গণেশ' ছিলেন কর্ম্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্ম্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির মতে এঁর দৃষ্টি পড়্‌লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না, বেদজ্ঞ আচার্য্যত্ব পান না, ছাত্রের বিদ্যা হয় না, বণিক ব্যবসায়ে লাভ কর্‌তে পারে না, চাষীর ক্ষেতে ফসল ফলে না। এই জন্যই 'গণেশের' অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাঁকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে; এবং গণেশের যে পূজা, তা' ছিল এই ভয়ঙ্কর দেবতাটিকে শান্ত রাখার জন্য; তিনি কাজকর্ম্মের উপর দৃষ্টি না দেন, সেজন্য ঘুষের ব্যবস্থা। গণ-শক্তির উপর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্ত্তাদের মনোভাব কি ছিল, তা' গণেশের নর-শরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ।

কিন্তু এ মনোভাব প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়। সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্ত্তারাই জনসঙ্ঘকে 'লম্বোদর গজানন' ব'লেই জেনেছেন। ওর হাত-পা মানুষের, কিন্তু ওর কাঁধের উপর যে মাথাটি তা' মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের। আর ওর উদর এত প্রকাণ্ড যে, তাকে যথার্থ ভরাতে হ'লে, যাদের কাঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সব দেশের যারা বুদ্ধিমান লোক, তারা, ওর মগজে মানুষের বুদ্ধির পরিবর্ত্তে জানোয়ারের নির্ব্বুদ্ধিতা রয়েছে ভরসায়, ওর বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা ক'রে এসেছে। সেই জন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও বা খোসামোদে তুষ্ট করতে হ'য়েছে। কারণ আদিকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত কোনও 'পলিটিশ্যানের পলিটিক্যাল' খেলা এ দেবতাটির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। অথচ সে সাহায্য পেতে হবে বিশেষ খরচের মধ্যে না গিয়ে। অর্থাৎ গণদেবতার পূজায় ভোগের উপকরণের দৈন্য সকলেই মন্ত্রের বহরে পূরণ করেছে;—'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা,' 'গণবাণীই ভগবদ্বাণী,' 'সুরাজ থেকে স্বরাজ শ্রেষ্ঠ', 'জননায়ক হচ্ছে জনসেবক,' ইত্যাদি। এবং সকলেই 'লম্বোদর গজেন্দ্র-বদনের' সৌন্দর্য্যবর্ণনায় শ্লোক রচনা ক'রে তাকে তোষামোদে খুসি করেছে।

যারা গণদেবতাকে খোসামোদে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাঁসিল করতে চায় না, চায় ঐ দেবতাটির নিজের হিত—তাদের এ

কথা মেনে নেওয়াই ভাল যে, এ দেবতার মানুষের শরীরের উপর গজমুণ্ডের কল্পনা একবারে মিথ্যা কল্পনা নয়। কোন্ শনির কুদৃষ্টিতে এর নরমুণ্ড খ'সেছে সে ঝগ্‌ড়া আজ নিরর্থক। কোন্ দেবতার শুভদৃষ্টি এর মুণ্ডকে মানুষের মাথায় পরিণত করবে, সেইটি জানাই প্রয়োজন। কারণ খোসামুদেরা যাই বলুক, মানুষের কাঁধে হাতীর মাথা সুন্দর নয়, নিতান্ত অশোভন।

যে দেবতার সুদৃষ্টি এই অঘটন ঘটাতে পারে, তিনি হচ্ছেন বীণাপাণি, যিনি জ্ঞানের দেবতা। এক জ্ঞানের শক্তি ছাড়া গজমুণ্ডকে নরমুণ্ডে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আর কিছুরই নেই। সুতরাং গণদেবতার যারা হিতকামী, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা। জনসঙ্ঘকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, সভ্যতার ফলভোগী করতে হ'লে, প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আকাশে বিস্তৃত বিশ্ব ও তার জটিল কার্য্যকারণজাল; কালে প্রসৃত মানুষের বিচিত্র ইতিহাস, ও এই দেশ ও কালের মধ্যে বর্ত্তমান মানুষের গতি ও পরিণতির জ্ঞান। আজকের দিনের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ; ধন উৎপাদন ও বিতরণের অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান এমন অদ্ভুত জটিল ও বহুবিস্তৃত হ'য়ে উঠ্‌ছে যে, অজ্ঞান জনসাধারণকে মাঝে মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে বুদ্ধিমান লোকের নিজের হিত খুব সম্ভব হ'লেও, জনসাধারণের হিত একেবারেই সম্ভব নয়। বাইরের পরামর্শে গড়া ঐ সব সাময়িক

উত্তেজনার দল, সঙ্ঘের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ক্রমাগত ভেঙ্গে যায়; আর যতদিন টিকে থাকে, ততদিনও ঐ পরামর্শদাতাদের ক্রীড়নক হ'য়েই থাকে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তার নিজের হিতের পথ নিজেকে চিন্‌তে শেখান' কেবল বহুকষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ নয়, ঐ দীর্ঘ ঘোরান' পথ ছেড়ে, খাড়া সরল পথে তার হিতচেষ্টার প্রলোভন দমন করাও দুঃসাধ্য। এই নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের দলকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিয়ে দিতে কোন্ জন-হিতৈষীর না লোভ হয়! কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের গতির দিকে চেয়ে এ লোভ দমন কর্‌তে হবে। অজ্ঞান মানুষের খুব বড় দলও চক্ষুষ্মান মানুষের ছোট দলের বিরুদ্ধে অনেক দিন দাঁড়াতে পারে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে যে অল্প-সংখ্যক লোক জনসাধারণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের বিরোধী মনে ক'রে তাকে চেপে রেখেছে, তারা আর যা-ই হোক, অতি কৌশলী ও বুদ্ধিমান লোক। এদের সঙ্গে লড়্‌তে হ'লে, ভেবে না বুঝ্‌লে একদিন ঠেকে শিখ্‌তে হবে যে, সরল পথই সোজা পথ নয়।

কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার এইটিই একমাত্র, এমন কি প্রধান প্রয়োজন নয়। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা' চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আন্‌তে হবে, যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা'-সব অমূল্য সৃষ্টি,—তার জ্ঞানবিজ্ঞান,

তার কাব্যকলা,—তার মূল্য জান্‌তে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত ব'লে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এই সব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হ'লেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে সব দেশে আজ জনসঙ্ঘ মাথা তুল্‌ছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা' সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝ্‌তে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তি লাভের যা' গুরুতর বাধা, অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্ব্বল হ'য়ে আসে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের স্বার্থের বাধা সভ্য-মানুষের মনের এই আশঙ্কার বলেই এত প্রবল। এই আশঙ্কার মধ্যে যা' সত্য আছে তা' যতটা দূর হবে, জনসাধারণের শক্তিলাভের পথের বাধাও ততটা ভেঙ্গে পড়্‌বে। উদরসর্ব্বস্ব গজমুণ্ডধারী গণদেবের অভ্যুত্থান স্বার্থান্ধ মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের কাছেও বিপৎপাৎ ব'লেই গণ্য হবে। গণদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আস্‌বে, সেদিন তার বিজয়-যাত্রার পথ কেউ রুখ্‌তে পার্‌বে না।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩
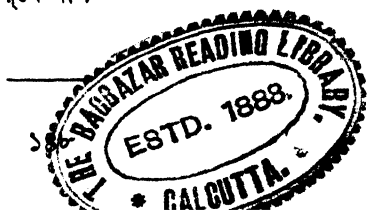
শিক্ষা ও দীক্ষা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

"স্বদেশীযুগে বাঙ্গালী সবচেয়ে বেশী ব্যর্থকাম হইয়াছে জাতীয় শিক্ষায়। আমরা জাতীয় শিক্ষার মূল-মর্ম্মের দিক হইতে কোন দিন শক্তির খেলাকে বুঝিতে ও চিনিতে চেষ্টা করি নাই—তাই আসল বস্তুটিকেও ধরিতে এবং যথার্থ রূপ দিতে পারা যায় নাই। নলিনীবাবুর প্রবন্ধগুলিতে সেই অভাব পূরণের একটা ধারাবাহিক চিন্তা ফুটিয়া উঠিয়াছে।—শিক্ষার মূল যে দীক্ষা—ভারতের এই সনাতন কেন্দ্রতত্ত্বটি যতদিন না আমরা ধরিতে পারিব, ততদিন জাতীয় শিক্ষা ও জাতিগঠনের প্রয়াস সকলই ভিত্তিহীন হওয়ায় পণ্ডশ্রম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নলিনীবাবু তাঁহার সমগ্র চিন্তার মৌলিক উপাদানরূপে এই সত্যটি স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন।"—প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক, ১৩৩৩।

"জাতীয় বিশিষ্ট চরিত্রের ধারা অব্যাহত রাখিয়া যাহাতে মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে—তেমন শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ হইতে আমরা কোন্ দিকে কতটা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি এবং উদ্ধারের পথই বা কোথায়, কোন্ দিকে—তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা শ্রদ্ধেয় নলিনীবাবু তাহা প্রদর্শন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শিক্ষাসম্পর্কে এই পুস্তকে জানিবার, বুঝিবার, ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। শিক্ষা-সমস্যা লইয়া যাঁহারা ভাবেন—এ গ্রন্থখানি তাঁহাদিগকে পথের সন্ধান দিবে সন্দেহ নাই।"—আনন্দবাজার।

দাম দেড় টাকা।

ভাবী-সমাজ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

"গ্রন্থকার সমাজতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সমাজের গতি-মুক্তির জন্য যে সমস্ত উপাদান অতীতে কাজে লাগিয়াছে এবং ভবিষ্যতে লাগিবে সে সকলের যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এমন বিশ্লেষণমূলক আলোচনা আমরা খুব কম দেখিয়াছি।"—আনন্দবাজার, ভাদ্র, ১৩৩৪।

"The author has a wonderful power of convincing others by force of his strong logical arguments. Lovers of literature will find the work to be an interesting reading."—*Forward*, Sept. 1927.

দাম দেড় টাকা

ভারতের নবজন্ম

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

"ভারতের অতীত শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও অধ্যাত্মসাধনার নবরূপান্তরে বিকাশের বহুমুখী বিচিত্র ভঙ্গী, মনীষী অরবিন্দের সুনির্ম্মল মানসদর্পণে যেভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"—আনন্দবাজার, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩।

"The passionate fervour of the great patriot for his national culture has been expressed in so charming a style that it is impossible to stop until one reaches the back-cover."—*Forward*.

দাম পাঁচ সিকা

বিপ্লবের পথে

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

"রাষ্ট্র ও সমাজে এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতীয় চরিত্র নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য, যে যথেষ্ট উদ্যম দেখা গিয়াছে, 'বিপ্লবের পথে' পুস্তকে নলিনীবাবু তাহাই নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নবযুগের নূতন ভাবের সাধকগণ ইহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় পাইবেন।"—আনন্দবাজার।

"গ্রন্থকারের যুক্তি অন্ধ নয়, চিন্তা দেশের প্রতি মমত্বে পরিপূর্ণ, কর্ত্তব্যের ইঙ্গিতে দূরদর্শিতার ছাপ সুস্পষ্ট। ভাষা যেমন সরল তেমনি জোরালো। আমরা এই গ্রন্থখানির সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"
—ভারতবর্ষ।

দাম পাঁচ সিকা

ভারতের দাবী

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

"লেখক অনেক গভীর চিন্তার খোরাক দান করিয়াছেন। গুরুতর বিষয় সকলের আলোচনা লেখক করিয়াছেন বটে, কিন্তু লেখকের ভাষা কোথাও সহজবোধ্যতা হারায় নাই।...আলোচ্য বইখানি প্রত্যেক স্বদেশসেবী ও দেশমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।"—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

দাম বার আনা